অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল

সম্পাদনা

ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

ড. মো. ইনামুল হক

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

www.fri.gov.bd

মৎস্য সপ্তাহ প্রকাশনা ১০

অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ
অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল

রচনা

ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ
ড. মো. খলিলুর রহমান
ড. মো. ইনামুল হক
ড. জুলফিকার আলী
ড. মোহসেনা বেগম তনু
ড. অনুরাধা ভদ্র
ড. আব্দুর রাজ্জাক
ড. ডুরিন আখতার জাহান
ড. মো. লতিফুল ইসলাম
ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
মোহাম্মদ ফেরদৌস সিদ্দিকী
মোছা. সোনিয়া শারমীন
মো. শাহ্‌জাদ কুলি খান
মো. মহিদুল ইসলাম
জাকিয়া হাসান
পারভেজ চৌধুরী
মো. মিজানুর রহমান ওয়াসীম
সোনিয়া স্কু
নূর-এ-রওশন
মো. সাইফুল ইসলাম
ড. মো. আসাদুজ্জামান

প্রকাশনায়
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ ২২০১
www.fri.gov.bd

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১৮

গ্রাফিকস্
ফিউশন, ময়মনসিংহ

মুদ্রণ
চৌধুরী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
ম য় ম ন সিং হ

অর্থায়নে
সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
বিএফআরআই, কক্সবাজার

Bangladesh Fisheries Research Institute. 2018.
Non-conventional Fisheries Resources:
Economic Importance & Culture Management Techniques.
Fish Week Publication No. 10.
Bangladesh Fisheries Research Institute. 64 p.

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

০৩ শ্রাবণ ১৪২৫
১৮ জুলাই ২০১৮

জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ এবং ৫১১ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ ও চিংড়ি রয়েছে। অভ্যন্তরিণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৩য় এবং চাষে ৫ম। দেশ এখন মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী মৎস্যবান্ধব বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মৎস্য খাতে আমাদের এই অর্জন ও সাফল্য জাতির জন্য গৌরবের।

আমাদের বিস্তর জলরাশি অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদেও সমৃদ্ধ। এসব অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদের মধ্যে রয়েছে কাঁকড়া, কুচিয়া, শামুক, ঝিনুক, লবস্টার, ওয়েস্টার, সী-উইড ইত্যাদি। অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন এসব মৎস্যসম্পদের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এ বিবেচনায় সম্ভাবনাময় অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) ইতোমধ্যে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে।

ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় কুচিয়ার পোনা উৎপাদন এবং চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি শীলা কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনেও প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে। তাছাড়া, ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা মিঠাপানির ঝিনুকে ইমেজ মুক্তা উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। একইভাবে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন অপ্রচলিত জলজসম্পদ সী-উইড চাষ ও ব্যবহার বিষয়ে ইনস্টিটিউট কর্তৃক গবেষণা পরিচালনা করে দেশের সমুদ্র উপকূলে এ অবধি ৯১ প্রজাতির সী-উইড এর সন্ধান পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ১০ প্রজাতির সী-উইড বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন। এই ১০ প্রজাতির সী-উইডের মধ্যে ৩ প্রজাতির সী-উইডের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন অন্যান্য অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ নিয়েও পর্যায়ক্রমে গবেষণা পরিচালনার জন্য ইনস্টিটিউটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৮ উপলক্ষে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট **অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ: অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল** শীর্ষক একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আশা করি, এই নির্দেশিকাটি দেশের অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদের চাষ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ নির্দেশিকাটি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নারায়ন চন্দ্র চন্দ এমপি**)**

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

০৩ শ্রাবণ ১৪২৫
১৮ জুলাই ২০১৮

মাছ আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি। বর্তমান সরকারের দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রচলিত মৎস্যসম্পদ ছাড়াও এদেশ বৈচিত্র্যময় অপ্রচলিত জলজসম্পদেও সমৃদ্ধ। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন এসব অপ্রচলিত জলজসম্পদের মধ্যে শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, কুচিয়া, রাজ কাঁকড়া, স্কুইড, ওয়েস্টার, লবস্টার, সী-উইড ইত্যাদি অন্যতম। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ সুরক্ষা এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদের চাষ ও উন্নয়ন এখন সময়ের দাবি। বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন এবং 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি)' অর্জনে এসব অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদের গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, এদেশের জলবায়ু ও পরিবেশ অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদের প্রজনন ও প্রতিপালনের জন্য খুবই উপযোগী। অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের আমিষ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এতে একদিকে যেমন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে, অন্যদিকে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) ইতোমধ্যে বিভিন্ন অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করছে। এরমধ্যে কাঁকড়া এবং কুচিয়ার প্রজনন ও চাষ, সী-উইড চাষ, মিঠাপানির ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন, শামুক-ঝিনুকের প্রজনন ও চাষ অন্যতম। ইনস্টিটিউট থেকে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ এবং বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন সী-উইড এর প্রজাতি নির্বাচন ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। কাঁকড়া ও কুচিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ এবং মিঠাপানির ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন গবেষণায় ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শামুক-ঝিনুকের উপর অধিকতর গবেষণা পরিচালনার জন্য ইনস্টিটিউট থেকে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে অপ্রচলিত সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ 'ব্লু ইকোনমি'তে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, মৎস্য সপ্তাহ ২০১৮ উপলক্ষে বিএফআরআই **অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদঃ অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল** শীর্ষক একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। নির্দেশিকাটি দেশের অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে নীতি নির্ধারক, গবেষক, উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকদের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি বিএফআরআই এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

(মো. রইছউল আলম মন্ডল)

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুখবন্ধ

০৩ শ্রাবণ ১৪২৫
১৮ জুলাই ২০১৮

প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। দেশ এখন মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমান সরকার কর্তৃক মৎস্যবান্ধব নানামূখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর আমাদের এই অভূতপূর্ব সাফল্য সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে। গৌরবময় এ অর্জনকে সামনে রেখে মৎস্য সপ্তাহের এবারকার প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ মাছে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'।

প্রচলিত মৎস্যসম্পদের অভূতপূর্ব সাফল্যের পাশাপাশি বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ যেমন কাঁকড়া, কুচিয়া, শামুক, ঝিনুক, সী-উইড, ওয়েস্টার, স্কুইড ইত্যাদি উন্নয়নে আমাদের সাফল্য অর্জন করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে এসব অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে এবং এসব সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও দেশের অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদের উন্নয়নে কাজ করার জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কাঁকড়া, কুচিয়া, শামুক, ঝিনুক, সী-উইড ইত্যাদি অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করছে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব প্রজাতি আমাদের দেশের আবহাওয়ায় বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ করা সম্ভব। কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন, সী-উইড চাষ, কুচিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ, ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউটের সফলতা অর্জিত হয়েছে। এসব প্রজাতি ছাড়াও বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন স্কুইড, লবস্টার, ওয়েস্টার, সাতারু কাঁকড়া, রাজ কাঁকড়া ইত্যাদি উন্নয়নেও ইনস্টিটিউট থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন এবং 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি)' অর্জনে এক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনার নির্দেশনা রয়েছে।

অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদের উপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফল এবং এদের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নিয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৮ উপলক্ষ্যে **অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ: অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল** শীর্ষক একটি নির্দেশিকা ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ নির্দেশিকাটি দেশের অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। নির্দেশিকাটি প্রণয়নে যারা সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

(ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ)

সূচি...

সী-উইড বা সামুদ্রিক শৈবালের প্রাপ্যতা, চাষ ও ব্যবহার ০১
মো. মহিদুল ইসলাম, জাকিয়া হাসান, ড. জুলফিকার আলী ও ড. মো. ইনামুল হক

শামুক ও ঝিনুকের চাষ এবং ব্যবহার সম্ভাবনা ১১
সোনিয়া স্কু, পারভেজ চৌধুরী ও ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

কুচিয়া মাছের প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনা ১৬
ড. ডুরিন আখতার জাহান, মোছাঃ সোনিয়া শারমীন ও নূর-এ-রওশন

কাঁকড়া আহরণ, পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা ২১
ড. মো. লতিফুল ইসলাম

লবস্টার: সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণে নতুন সম্ভাবনা ২৬
মো. সাইফুল ইসলাম ও ড. অনুরাধা ভদ্র

উপকূলে সবুজ ঝিনুক চাষের সম্ভাবনা ৩০
ড. মো. আসাদুজ্জামান, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়

সী-ফুড বা সামুদ্রিক খাদ্য হিসেবে স্কুইডের সম্ভাবনা ৩৪
মোছাঃ সোনিয়া শারমীন

সাতারু কাঁকড়ার আহরণ ও সম্ভাবনা ৩৯
মো. শাহ্জাদ কুলি খান, ড. আব্দুর রাজ্জাক ও ড. মো. জুলফিকার আলী

বাংলাদেশে রাজ কাঁকড়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও সম্ভাবনা ৪২
ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

সাগর উপকূলে ওয়েস্টার চাষ ৪৫
মো. মিজানুর রহমান ওয়াসীম

বাংলাদেশের বাহারী মাছ ৪৮
ড. মো. খলিলুর রহমান

মিঠাপানির ঝিনুকে মুক্তা চাষ ৫৪
ড. মোহসেনা বেগম তনু, মোহাম্মদ ফেরদৌস সিদ্দিকী ও সোনিয়া স্কু

ডলফিন সংরক্ষণ ৬০
ড. মো. ইনামুল হক

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ৬৩

১৩

সী-উইড বা সামুদ্রিক শৈবালের প্রাপ্যতা, চাষ ও ব্যবহার

সামুদ্রিক শৈবাল বা সী-উইড সাগরের এক প্রকার তলদেশীয় জলজ উদ্ভিদ (মেরিণ ম্যাক্রোঅ্যালজি)। সী-উইড বিশ্বব্যাপি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক সম্পদ, পুষ্টিগুণের বিচারে যা বিভিন্ন দেশে খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচ্যে বিশেষত জাপান, চীন ও কোরিয়ায় সনাতনভাবেই দৈনন্দিন খাদ্যে সী-উইড ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে এবং দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইউরোপে এর ব্যবহার বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। মূলত ৩ ধরণের সী-উইডের ভেতর বাদামী অ্যালজি (৬৬%), লাল অ্যালজি (৩৩%) ও সবুজ অ্যালজি (১%) খাদ্য হিসেবে সমাদৃত। মানব খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও ডেইরী, ঔষধ, টেক্সটাইল ও কাগজ শিল্পে সী-উইড আগার কিংবা জেল জাতীয় দ্রব্য তৈরিতে কাচামাল হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, জমিতে সার, প্রাণি খাদ্য ও লবণ উৎপাদনেও সী-উইড ব্যবহার করা হয়। সী-উইডে প্রচুর পরিমাণে খনিজ দ্রব্য বিদ্যমান থাকায় খাদ্যে অণূপুষ্টি হিসেবে এর ব্যবহার গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। পৃথিবীতে প্রায় ২৬ মিলিয়ন টন সামুদ্রিক শৈবাল চাষ বা আহরিত হয়ে থাকে যার মধ্যে এশিয়ায় চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, কোরিয়া ও জাপান ৮০% এর বেশি সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদন করে থাকে। বিশ্বে প্রতি বছর সামুদ্রিক শৈবালের উৎপাদন প্রায় ২০-২৮ মিলিয়ন টন যার বাজার মূল্য প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের উপকূলীয় ৫০ মিটার গভীরতায় মহীসোপান অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৩৭,০০০ বর্গকিলোমিটার। এ বিশাল সমুদ্র জলসীমা অত্যন্ত উর্বর এবং এখানে রয়েছে মৎস্যসম্পদসহ প্রচুর সামুদ্রিক সম্পদ। এসব সামুদ্রিক সম্পদ নবায়নযোগ্য হওয়ায় টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় অনন্তকাল পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে এশিয়ার অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের উপকূলে সী-উইডের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

বাংলাদেশ উপকূলে সী-উইড

সামুদ্রিক শৈবাল সামুদ্রিক পরিবেশে খাদ্য উৎপাদক। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কক্সবাজার জেলার টেকনাফসহ সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও বাঁকখালী মোহনার আশপাশের পাথুরে ও প্যারাবন এলাকায় জোয়ার-ভাটার অন্তবর্তী স্থানেই অধিকাংশ সী-উইড দেখতে পাওয়া যায়। সেন্টমার্টিন দ্বীপে প্রায় ১৪০ ধরনের ও বাঁকখালী-মহেশখালী চ্যানেলের মোহনায় ৫ প্রজাতি এবং প্যারাবন এলাকাতে ১০ প্রকারের সী-উইড পাওয়া যাওয়ার কথা শোনা যায়। সী-উইড জন্মানোর জন্য কিছু ভিত্তির প্রয়োজন পড়ে। সাধারণত: বড় পাথর, প্রবাল, শামুক-ঝিনুক-পলিকিটের খোসা, প্যারাবনের গাছ-শিকড়, শক্ত মাটি কিংবা অন্য যেকোন শক্ত বস্তুর উপর সী-উইড জন্মে। কক্সবাজার ও পার্বত্য অঞ্চলের রাখাইন ও অন্যান্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠী সালাদ ও চাটনী হিসেবে সী-উইড আহার করে থাকে। স্থানীয় ভাষায় সী-উইড 'হেজালা' নামে পরিচিত। এদেশে বাণিজ্যিকভাবে সী-উইড উৎপাদনের তথ্য পাওয়া না গেলেও বহুপূর্ব হতে উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাপ্য সী-উইড পার্শ্ববর্তী দেশে পাচার হওয়ার কথা শোনা যায়। কক্সবাজার উপকূলে সামুদ্রিক শৈবাল সংগ্রহ করে রৌদ্রে শুকিয়ে প্রতি মন ৩,৫০০-৬,০০০ টাকায় স্থানীয় বাজার ও মিয়ানমারে বিক্রি করছে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র ২০১৩ সাল হতে সী-উইড নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইনস্টিটিউট থেকে কক্সবাজার সদর উপজেলার বাঁকখালী নদী-মহেশখালী চ্যানেলের মোহনায় নুনিয়ারছড়া থেকে নাজিরারটেক পর্যন্ত সৈকত সংলগ্ন জোয়ার-ভাটা এলাকা ও মহেশখালী দ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন সী-উইডের প্রাকৃতিক উৎপাদন ক্ষেত্র সনাক্ত করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের শৈবাল গবেষক দল সেন্টমার্টিন দ্বীপ, ইনানী, বাঁকখালী মোহনা ও টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ, শাপলাপুর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৯১টি সী-উইডের নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে সংরক্ষণ করেছে। এসব সী-উইডের মধ্যে প্রায় ১০টি প্রজাতি বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন।

সারণি ১. কক্সবাজার উপকূলে বিভিন্ন সামুদ্রিক শৈবালের এলাকাভিত্তিক প্রাপ্যতা

সামুদ্রিক শৈবালের নাম	প্রকার	এলাকা	নভে.	ডিসে.	জানু.	ফেব্রু.	মার্চ	এপ্রি.
Actinotrichia fragilis	লোহিত	সেন্টমার্টিন		+	++	++	+	+
Amphiroa (2 sp.)	লোহিত	সেন্টমার্টিন, ইনানী			+	++	+	
Asparagopsis taxiformis	লোহিত	সেন্টমার্টিন		+	++	+++	++	
Caulerpa (6 sp.)	সবুজ	সেন্টমার্টিন, টেকনাফ	+	+	++	+++	+++	+
Cladophora (3 sp.)	সবুজ	সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, ইনানী, বাঁকখালী		+	+	++	+	
Codium (2 sp.)	সবুজ	সেন্টমার্টিন				+	++	+
Colpomenia (2 sp.)	বাদামি	সেন্টমার্টিন		+	+++	++	+	+
Dermonema pulvinatum	লোহিত	সেন্টমার্টিন, ইনানী				+	++	+
Dictyota (4 sp.)	বাদামি	সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, ইনানী		+	++	++	++	+
Dudresnaya verticillata	লোহিত	সেন্টমার্টিন			+	++	+	
Enteromorpha (3 sp.)	সবুজ	সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, ইনানী, বাঁকখালী	+	+	+++	+++	++	+
Eucheuma (2 sp.)	লোহিত	সেন্টমার্টিন			+	++	+	
Galauxara (2 sp.)	লোহিত	সেন্টমার্টিন		+	++	++	+	+
Ganonema pinnatum	লোহিত	সেন্টমার্টিন				+	++	
Gelidium (2 sp.)	লোহিত	সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, ইনানী, বাঁকখালী		+	+	++	+	+
Gracilaria (5 sp.)	লোহিত	সেন্টমার্টিন, টেকনাফ		+	++	++	+	+
Grateloupia lanceolata	লোহিত	সেন্টমার্টিন			+	++	+	
Halymenia (3 sp)	লোহিত	সেন্টমার্টিন			+	++	+	+
Helimeda (5 sp.)	সবুজ	সেন্টমার্টিন, টেকনাফ		+	+	++	+	+
Hydroclathrus (2 sp.)	বাদামি	সেন্টমার্টিন		+	+++	+++	+	+
Hypnea (6 sp.)	লোহিত	সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, ইনানী, বাঁকখালী	+	+++	+++	+++	+++	+
Jania (2 sp.)	লোহিত	সেন্টমার্টিন			++	+	+	+
Laurencia pinnata	লোহিত	সেন্টমার্টিন				+	++	+

সামুদ্রিক শৈবালের নাম	প্রকার	এলাকা	নভে.	ডিসে.	জানু.	ফেব্রু.	মার্চ	এপ্রি.
Liagora (3 sp.)	লোহিত	সেন্টমার্টিন, ইনানী			+	+	++	+
Lithophyllum (2 sp.)	লোহিত	সেন্টমার্টিন				+	++	+
Lithothamnion (2 sp.)	লোহিত	সেন্টমার্টিন			+	++	+	
Nemalion helminthoides	লোহিত	টেকনাফ, ইনানী					+	+
Padina (7 sp.)	বাদামি	সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, ইনানী		+	+++	+++	+	+
Peyssonellia (2 sp.)	লোহিত	সেন্টমার্টিন			+	+	+	+
Porphyra (2 sp.)	লোহিত	সেন্টমার্টিন		+	+	+	++	
Ralfsia (2 sp.)	বাদামি	সেন্টমার্টিন			+	++	+	
Rosenvingea (2 sp.)	বাদামি	সেন্টমার্টিন, ইনানী				++	+++	+
Sargassum (5 sp.)	বাদামি	সেন্টমার্টিন		+	++	+++	+++	+
Tricleocarpa cylindrica	লোহিত	সেন্টমার্টিন				+	++	+
Ulva (3 sp.)	সবুজ	সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, ইনানী, বাঁকখালী		+	++	+	+	+

+ সাধারণ প্রাপ্যতা, ++ অধিক প্রাপ্যতা, +++ সর্বাধিক প্রাপ্যতা

চিত্র ১. কক্সবাজার উপকূলে প্রাপ্য সামুদ্রিক শৈবালের বিভিন্ন প্রজাতি

বাংলাদেশে প্রাপ্ত সামুদ্রিক শৈবালের মধ্যে নিম্নোক্ত ১০টি শৈবাল প্রজাতি প্রাপ্যতা, চাষ, পুষ্টিমান এবং খাদ্য উপাদানের ব্যবহারের ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১. সবুজ শৈবাল (Chlorophyta) এর অন্তর্গত (*Caulerpa racemosa, Enteromorpha intestinalis*)

২. বাদামি শৈবাল (Phaeophyta) এর অন্তর্গত (*Colpomenia sinuosa, Dictyota dichotoma, Hydroclathrus clathratus, Padina tetrastromatica, Sargassum oligocystum, Sargassum ilicifolium*)

৩. লোহিত শৈবাল (Rhodophyta) এর অন্তর্গত (*Asparagopsis taxiformis, Hypnea musciformis*)

চিত্র ২. বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন সামুদ্রিক শৈবালের বিভিন্ন প্রজাতি

বাংলাদেশ উপকূলে সী-উইড চাষ

বাংলাদেশের জলবায়ুতে স্থানভেদে নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রায় ৬ মাস সী-উইড চাষ করা যেতে পারে। তবে সী-উইড চাষের সর্বোচ্চ অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান থাকে জানুয়ারী থেকে মার্চ এই তিন মাস। নারিকেলের ছোবড়ার রশি ও নাইলনের মাছ ধরার রশির জাল ব্যবহার করে ইনস্টিটিউট থেকে আনুভূমিক (horizontal) নেট পদ্ধতিতে সী-উইড চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, উপকূলের লেগুন বা আশ্রয়যুক্ত স্থান যা সাগরের প্রবল ঢেউ ও স্রোতের প্রভাবমুক্ত, দূষণমুক্ত পানি এবং জনউপদ্রব কম এমন জায়গা সী-উইড চাষের জন্য উপযুক্ত। সী-উইড প্রজাতি *Enteromorpha intestinalis, Hypnea musciformis* ও *Caulerpa racemosa* চাষের জন্য কক্সবাজার জেলার উপকূলবর্তী সেন্টমার্টিন, বাঁকখালী ও ইনানী এলাকার জোয়ার ও ভাটার মধ্যবর্তী স্থান (intertidal zone) নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত স্থানগুলোর মধ্যে সেন্টমার্টিন দ্বীপের পানির তলদেশ বালুকাময়, পাথুরে ও প্রবাল দ্বারা আবৃত, বাঁকখালীর পানির তলদেশ কাঁদা ও বালিযুক্ত এবং ইনানীর পানির তলদেশ বালুকাময়, শিলা পাথর, খোলস চূর্ণ ও নুড়ি পাথরযুক্ত।

চাষ পদ্ধতি : চাষের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার তৈরি রশি দ্বারা ৪মি.×৪মি. জাল (২০ সেমি. ফাঁসযুক্ত) আনুভুমিকভাবে স্থাপন করা হয়। নতুন জন্ম নেয়া অল্প বয়স্ক বাড়ন্ত সী-উইড প্রজাতির *Enteromorpha intestinalis, Hypnea musciformis* ও *Caulerpa racemosa* গড়ে ৫ সেমি. দৈর্ঘ্যের ৪±০.০৫ কেজি বীজ (প্রতি বর্গমিটারে ১±০.০১ কেজি) চাষের জন্য তৈরিকৃত জালের রশির গিটের ফাঁকে আটকিয়ে দেয়া হয়। জালটির চারপাশ বাঁশের সাথে ঢিলে করে বেধে দেয়া হয় এবং ১০টি প্লাস্টিকের বয়া বা প্লাস্টিক ফ্লোটস এমনভাবে আটকিয়ে দেয়া হয় যাতে জালটি সবসময় ০.৫ মি.- ০১ মি. পানির গভীরতায় থাকে। প্রায় ১৫ দিন পরে সী-উইড যখন ৩০±৫ সেমি. দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হয় তখন সেগুলোর গোড়া বাদ দিয়ে আহরণ করা হয়। এভাবে প্রতি ১৫ দিন পরপর আংশিক আহরণ ও দৈনিক বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হয়।

চিত্র ৩. সেন্টমার্টিন, বাঁকখালী ও ইনানীতে সী-উইডের চাষ

সাম্প্রতিক সময়ে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এই তিন মাসের *Enteromorpha intestinalis* এর পরীক্ষামূলক চাষে সেন্টমার্টিন, ইনানী ও বাঁকখালীতে ১৫ দিন অন্তর ৯০ দিনে মোট ১৮ বার আংশিক আহরণ করা হয়। সেন্টমার্টিনে ৬০তম দিনে সর্বোচ্চ ২৫.১০±০.৩৬ কেজি (সিক্ত ওজন) এবং ১৫তম দিনে সর্বনিম্ন ১১.৫৪±০.২৮ কেজি (সিক্ত ওজন) আংশিক আহরণ করা হয়। বাঁকখালীতে ৬০তম দিনে সর্বোচ্চ ২১.৭৩±০.৪০ কেজি এবং ১৫তম দিনে সর্বনিম্ন ১০.১০±০.৪০ কেজি আংশিক আহরণ করা হয়। ইনানীতে ৪৫তম দিনে সর্বোচ্চ ১২.৭৭±০.২৫ কেজি এবং ৯০তম দিনে সর্বনিম্ন ৭.২১±০.১০ কেজি আংশিক আহরণ করা হয় (রেখাচিত্র-১)।

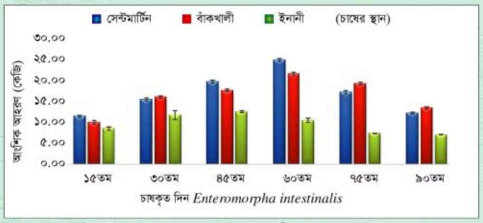

রেখাচিত্র ১. কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে ৯০ দিনে চাষকৃত *Enteromorpha intestinalis* এর আংশিক আহরণ

Enteromorpha intestinalis এর সর্বোচ্চ দৈনিক বৃদ্ধির হার সেন্টমার্টিনে ১৫তম দিনে ৬.৫৫±০.১৫% দিনপ্রতি এবং সর্বনিম্ন ইনানীতে ৯০তম দিনে ০.৬৫ষ্ট০.০৩% দিন প্রতি পাওয়া গেছে (রেখাচিত্র-২)।

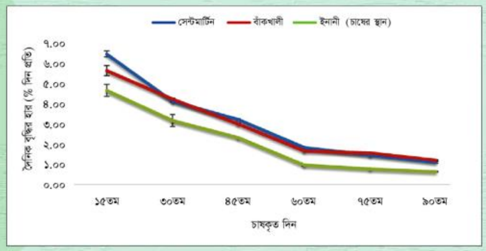

রেখাচিত্র ২. কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে ৯০ দিনে চাষকৃত *Enteromorpha intestinalis* এর দৈনিক বৃদ্ধির হার

সী উইড চাষকৃত তিনটি স্থানে ৯০ দিনে সামুদ্রিক শৈবালের মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ সেন্টমার্টিনের ২৪.৫০±০.০৮ কেজি (সিক্ত ওজন/মি.২), মধ্যম বাঁকখালীতে ২৩.৭৪±০.৮৩ কেজি (সিক্ত ওজন/মি.২) এবং সর্বনিম্ন ইনানীতে ১৩.৮৪±১.০৬ কেজি (সিক্ত ওজন/মি.২) পাওয়া গেছে (রেখাচিত্র- ৩)।

রেখাচিত্র ৩. কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে ৯০ দিনে চাষকৃত *Enteromorpha intestinalis* এর মোট উৎপাদন

সেন্টমার্টিনে *Caulerpa racemosa* ১৫ দিন অন্তর ৯০ দিনে মোট ৬ বার আংশিক আহরণ করা হয়। সেন্টমার্টিনে ৬০তম দিনে সর্বোচ্চ ১৪.৯৮±০.৩৩ কেজি (সিক্ত ওজন) এবং ৯০তম দিনে সর্বনিম্ন ৭.৫৩±০.২৫কেজি (সিক্ত ওজন) আংশিক আহরণ করা হয় (রেখাচিত্র-৪)।

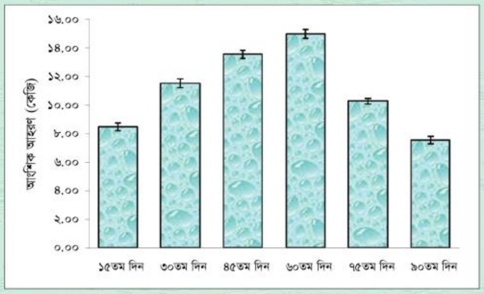

রেখাচিত্র ৪. কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনের উপকূলীয় অঞ্চলে ৯০ দিনে চাষকৃত *Caulerpa racemosa* এর আংশিক আহরণ

Caulerpa racemosa এর সর্বোচ্চ দৈনিক বৃদ্ধির হার সেন্টমার্টিনে ১৫তম দিনে ৪.৬০±০.১৯% দিনপ্রতি এবং সর্বনিম্ন ৩০তম দিনে ০.৬৩±০.০৪% দিনপ্রতি পাওয়া গেছে (রেখাচিত্র-৫)।

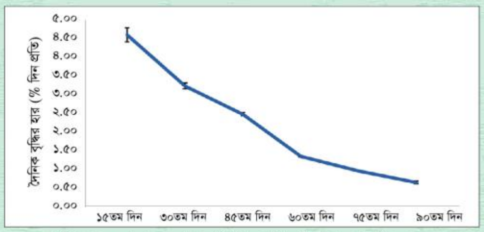

রেখাচিত্র ৫. কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনের উপকূলীয় অঞ্চলে ৯০ দিনে চাষকৃত *Caulerpa racemosa* এর দৈনিক বৃদ্ধির হার

সেন্টমার্টিনে ৯০ দিনে চাষকৃত *Caulerpa racemosa* এর মোট উৎপাদন ১৫.৫৮±০.১২ কেজি (সিক্ত ওজন/মি.২). *Hypnea musciformis* সেন্টমার্টিনে ১৫ দিন অন্তর ৯০ দিনে মোট ৬ বার আংশিক আহরণ করা হয়। সেন্টমার্টিনে ৬০তম দিনে সর্বোচ্চ ৩০.২৩±০.৪০ কেজি (সিক্ত ওজন) এবং ৯০তম দিনে সর্বনিম্ন ১৪.৫৩±০.৪৫ কেজি (সিক্ত ওজন) আংশিক আহরণ করা হয় (রেখাচিত্র-৬)।

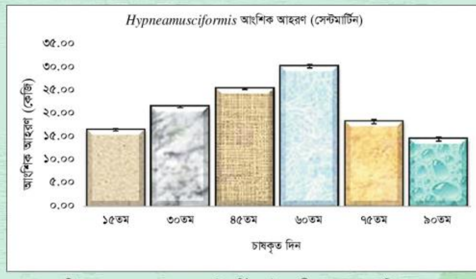

রেখাচিত্র ৬. কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনের উপকূলীয় অঞ্চলে ৯০ দিনে চাষকৃত *Hypnea musciformis* এর আংশিক আহরণ

Hypnea musciformis এর সর্বোচ্চ দৈনিক বৃদ্ধির হার সেন্টমার্টিনে ১৫তম দিনে ৮.৮৮±০.১০% দিন প্রতি এবং সর্বনিম্ন ৯০তম দিনে ১.২৯±০.০৩% দিন প্রতি পাওয়া গেছে (রেখাচিত্র-৭)।

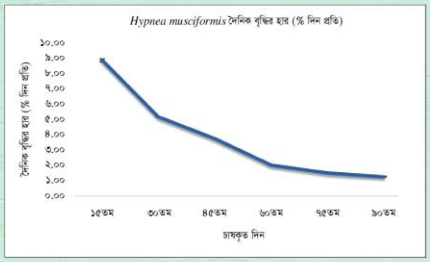

রেখাচিত্র ৭. কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনের উপকূলীয় অঞ্চলে ৯০ দিনে চাষকৃত *Hypnea musciformis* এর দৈনিক বৃদ্ধির হার

সেন্টমার্টিনে ৯০ দিনে চাষকৃত *Hypnea musciformis* এর মোট উৎপাদন ৩০.৬১±০.২৩ কেজি (সিক্ত ওজন/মি.২) পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ উপকূলে প্রাপ্য সী-উইডের পুষ্টিমান

সাধারণ পুষ্টিমান : নির্বাচিত সী-উইডের আদ্রতা (৮.৫৮-২৪.৬%) যার মধ্যে *Enteromorpha intestinalis* সর্বোচ্চ, খনিজ দ্রব্য (৩.৯৬-২৭.৯৫%) যার মধ্যে *Padina tetrastromatica* সর্বোচ্চ, আমিষ (৫.৭-২২.৩১%) যার মধ্যে *Hypnea* sp. সর্বোচ্চ, তৈল (০.৩-২.৬৫%) যার মধ্যে *Caulerpa racemosa* সর্বোচ্চ, আঁশ (৪.১-৬.৮%) যার মধ্যে *Padina tetrastromatica* সর্বোচ্চ এবং শর্করা (৩৫.৫-৬৩.১৪%) যার মধ্যে *Jania rubens* সর্বোচ্চ পাওয়া গেছে (সারণি-২)।

সারণি ২. নির্বাচিত সী-উইডের সাধারন পুষ্টিমান

সী-উইড প্রজাতি	ধরণ	সাধারণ পুষ্টিমান (গ্রাম/১০০ গ্রাম)					
		আদ্রতা	অ্যাশ	আমিষ	তৈল	আঁশ	শর্করা
Caulerpa racemosa	সবুজ	১৬.৩৬±০.৪	৯.৯±১.২	২২.২৫±১.১	২.৬৫±০.৭	৪.৮±০.২	৪৪.০৪±০.৭
Enteromorpha intestinalis	সবুজ	২৪.৬±০.৯	১৫.২±১.৫	১৯.৫±০.৬	০.৩±০.৫	৪.৯±০.৩০	৩৫.৫±১.৮
Padina tetrastromatica	বাদামি	১৫.৬৮±০.১	২৭.৯৫±০.৮	১২.২৯±০.৮	০.৯৮±০.৪	৬.৮±০.৫	৩৬.৩০±০.৯
Sargassum oligocystum	বাদামি	২১.০৯±০.৩	১২.৯৪±০.৫	৮.১৯±০.৬	০.৮৩±০.৩	৫.২±০.৬	৫১.৭৫±০.৭
Hypnea musciformis	লাল	২৪.৩১±০.৫	৯.৭৬±১.৪	১৩.৭৩±০.৮	০.৩৪±০.৪	৫.৬±০.৭	৪৬.২৬±০.৬
Hypnea sp.	লাল	১৭.৪৫±০.২	৩.৯৬±০.৯	২২.৩১±১.০	০.৭৮±০.৩	৪.১±০.৫	৫১.৪±০.৫
Jania rubens	লাল	৮.৫৮±০.৪	১৬.২৭±১.০	৫.৭±০.৭	০.৪১±০.১	৫.৯±০.৪	৬৩.১৪±০.৪

অণুপুষ্টি গুণ : নির্বাচিত সী-উইডের প্রত্যেকটিই প্রচুর পরিমাণে অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ যেখানে ক্যালসিয়াম ও সোডিয়াম *Jania rubens* এ সর্বোচ্চ ২,২৮৮.৯±০.৬ (গ্রাম/১০০গ্রাম) ও ১৬১.০±০.৪ (গ্রাম/১০০গ্রাম), *Hypnea sp.* এ পটাসিয়াম সর্বোচ্চ ৯৮.০±০.৮ (গ্রাম/১০০গ্রাম), লৌহ সর্বোচ্চ *Padina tetrastromatica* এ ২৮.৭±০.২ (গ্রাম/১০০গ্রাম), জিঙ্ক সর্বোচ্চ *Caulerpa racemosa* এ ০.৮±০.২ (গ্রাম/১০০গ্রাম) পাওয়া গেছে (সারণি-৩), যা আমাদের উপকূলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখতে পারে।

সারণি ৩. নির্বাচিত সী-উইডের অণুপুষ্টি গুণ

সী-উইড প্রজাতি	ধরণ	অণুপুষ্টি (গ্রাম/১০০ গ্রাম)				
		ক্যালসিয়াম	পটাসিয়াম	সোডিয়াম	লৌহ	জিঙ্ক
Caulerpa racemosa	সবুজ	২০২.০±০.১	২৫.৮±০.৪	১০৬.৬±০.৫	১৩.৩±১.০	০.৮±০.২
Enteromorpha intestinalis	সবুজ	১০৩.৮±০.৩	৩৫.০±০.১	৫১.৬±০.১	২১.৭±০.৩	০.৭±০.৩
Padina tetrastromatica	বাদামি	২৭৯.৪±১.১	৪১.৪±০.৩	৪.৭±০.৩	২৮.৭±০.২	০.১±০.৫
Sargassum oligocystum	বাদামি	২২৮.০±০.৪	৬০.৮±১.০	১৪৪.৪±১.২	২১.০±০.৩	০.২±০.৪
Hypnea musciformis	লাল	১৪০.৭±০.২	৩০.৮±০.২	১১০.৩±০.৫	১৪.২±০.৫	০.৫±০.১
Hypnea sp.	লাল	১০২.১±১.০	৯৮.০±০.৮	১৫০.০±০.১	১২.৫±০.৬	০.৪±০.২
Jania rubens	লাল	২,২৮৮.৯±০.৬	৭১.০±০.৫	১৬১.০±০.৪	৪.৬±১.১	-

এছাড়াও কক্সবাজার উপকূলে তিনটি স্থানে চাষকৃত *Hypnea musciformis* ও *Caularpa racemosa* প্রজাতির অণুপুষ্টির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে। চাষকৃত সী-উইডের প্রত্যেকটিতেই প্রচুর পরিমাণে অণুপুষ্টি রয়েছে যার মধ্যে সেন্টমার্টিনে চাষকৃত সী-উইডের অণুপুষ্টির পরিমাণ সর্বোচ্চ (সারণি-৪)।

সারণি ৪. কক্সবাজার উপকূলে চাষকৃত সী-উইড প্রজাতির অণুপুষ্টির পরিমাণ

উপাদান (মি.গ্রাম/কেজি)	*Hypnea musciformis*			*Caularpa racemosa*
	বাঁকখালী	ইনানী	সেন্টমার্টিন	সেন্টমার্টিন
ক্যালসিয়াম	৪০৫	৪,৯৬৯.৩৩	১৯,৮৩১.৮২	১৬,২৪৮.৯৩
পটাসিয়াম	৮৯১	১৬,২৯৯.৫৯	২০,৫২৫.৯৪	৯,৫৪৬.২৪
লৌহ	৩.০৩	৬২.৪১	৫৪০.৬১	৪৩৬.০৮
কপার	৩.২৪	৬.৯৫	১০.৭০	৯.৩৪
জিঙ্ক	৪.৬৫	৩.৭৭	১২.৬৯	৮.৫৩
আয়োডিন	১৮০	২২৫	১১২৫	১৩৫০

সামুদ্রিক শৈবালের ব্যবহার

সামুদ্রিক শৈবাল সমুদ্র থেকে সরাসরি খনিজ পদার্থ আত্তীকরণ করে থাকে। ফলে এটি আমাদের খাদ্য তালিকার এককভাবে সবচেয়ে পুষ্টিকর খাবার যা অধিক পরিমাণে ভিটামিন ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ। অনেক সামুদ্রিক শৈবালই মাছ/মাংসের থেকে বেশি আমিষ ও দুধের থেকে বেশি ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। আশার কথা হল, সামুদ্রিক শৈবালের এত প্রজাতির মাঝে বিষাক্ত প্রজাতির সংখ্যা খুবই সামান্য। চীন, জাপান, কোরিয়াতে সামুদ্রিক শৈবাল খাদ্য হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়। কিছু সামুদ্রিক শৈবাল প্রজাতি ক্যান্সার প্রতিরোধী উপাদান হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া সামুদ্রিক শৈবাল প্রদাহবিরোধী ও জীবাণুবিরোধী উপাদানেও সমৃদ্ধ যা রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় জনসংখ্যার বিরাট অংশ সাগরে মাছ আহরণ, চিংড়ি/কাঁকড়া চাষ ও লবণ চাষে জড়িত। মাছ ধরা বন্ধকালীন সময়ে উপকূলে বিকল্প আয়ের উৎস হতে পারে সামুদ্রিক শৈবাল চাষ। স্বল্প পূজিতে সামুদ্রিক শৈবাল চাষ একদিকে যেমন আয়ের উৎস হবে তেমনি খাদ্যভ্যাস পরিবর্তনে উচ্চ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন সামুদ্রিক শৈবাল উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারে। সামুদ্রিক শৈবালের রয়েছে বহুবিধ ব্যবহার। বাদামী ও লোহিত শৈবালের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। খাদ্য হিসেবে সাধারণত মেয়োনিজ, জেলি, ক্রিম, পুডিং, সস তৈরিতে এদের ব্যবহার রয়েছে। সামুদ্রিক শৈবাল উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, স্ট্রোক কমায়। ডায়রিয়া, বাত রোগ নিরাময়েও সামুদ্রিক শৈবাল ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ সামুদ্রিক শৈবালে সামুদ্রিক লবণের চেয়ে অধিক পরিমাণে আয়োডিন রয়েছে। ফলে সামুদ্রিক শৈবাল থাইরয়েড (গলগন্ড) রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ও কাজ করে।

বাংলাদেশের ৭১০ কিলোমিটারব্যাপি সমুদ্র সৈকত এবং ২৫ হাজার বর্গকিলোমিটারব্যাপী উপকূলীয় অঞ্চলে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে সামুদ্রিক শৈবাল চাষ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সামুদ্রিক মাছ/চিংড়ি ও কাঁকড়ার পাশাপাশি এ সামুদ্রিক শৈবাল চাষ ও রপ্তানি বাংলাদেশের নীল-অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্য ভান্ডারে ঘাটতি দেখা দিলে সামুদ্রিক শৈবাল আগামীদিনের খাদ্য ও পুষ্টির বিকল্প ভান্ডার হতে পারে।

শামুক ও ঝিনুকের চাষ এবং ব্যবহার

অমেরুদন্ডী প্রাণিদের শ্রেণিবিন্যাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে মলাস্কা গ্রুপের মধ্যে তিনটি শ্রেণি আছে যা গ্যাস্ট্রোপোড (শামুক), বাই-ভালভিয়া (স্ক্যালপ, ক্লাম, ঝিনুক, ওয়েস্টার) এবং সেফালোপোড (অক্টোপাস) গ্রুপ নামে পরিচিত। মিঠাপানিতে অল্প পরিমাণে হলেও অধিকাংশ মলাস্কা পাওয়া যায় সামুদ্রিক উৎস থেকে। এরা যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি জীববৈচিত্র, খাদ্য বা কীট হিসেবে অর্থনৈতিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ। মলাস্কে প্রচুর পরিমাণে গ্লাইকোজেন, লিপিড, প্রোটিন, ভিটামিন এ, বি এবং ডি এর উপস্থিতি ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের অপরিহার্য খনিজ পদার্থ রয়েছে। অপর দিকে মলাস্কের খোলসে বিদ্যমান ক্যালসিয়াম কার্বনেট যা সার বা চুন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি ঘরের শোভাবর্ধনে ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন- জাপান, থাইল্যান্ড, মালেয়শিয়া, কম্বোডিয়া, চীন, ভিয়েতনাম এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার খাবার হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। বাংলাদেশে শুধুমাত্র আদিবাসী জনগোষ্ঠী ছাড়া এ সকল খাবারে কেউই তেমন অভ্যস্ত নয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার চাষের জন্য খুবই উপযোগী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন- মাছের খাবার, চিংড়ির খাবার, হাঁস মুরগীর খাবার এবং সার ও চুন তৈরিতে ঝিনুক ও শামুক ব্যবহার করা হয়। শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার এর মাংসল অংশ প্রোটিনের এক অনন্য উৎস। এছাড়া বাংলাদেশে প্রাপ্ত বেশ কিছু প্রজাতির ঝিনুক ও ওয়েস্টারে মুক্তা পাওয়া যায় এবং প্রণোদিত উপায়ে মুক্তা উৎপাদনও করা যায়। দেশীয় বাজারে বিভিন্ন কাজে চাহিদা থাকলেও বিদেশে রপ্তানির কোন তথ্য এখনও পরিলক্ষিত হয়নি।

বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে এই পর্যন্ত ৩৬২ প্রজাতির মলাস্ক সনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩৩৬টি প্রজাতি পাওয়া যায় সমুদ্রে এবং ২৬টি প্রজাতি পাওয়া যায় মিঠাপানিতে। বাংলাদেশে প্রাপ্য মলাস্কের মধ্যে শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার অন্যতম। কালের পরিক্রমায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও যত্রতত্র মানুষের বিচরণ বেড়ে যাওয়ায় অনেক জলজ প্রাণিই আজ বিলুপ্তির পথে। শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার বিলুপ্ত না হলেও এদের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছে। শামুক ও ঝিনুকের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। প্রাকৃতিক উৎস হতে আহরণ নিয়ন্ত্রণ এবং শামুক ও ঝিনুকের চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করার মাধ্যমে এ সম্পদ হতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার এর চাষ ব্যবস্থাপনা ও পোনা উৎপাদনের উপর গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে।

বাংলাদেশে শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার এর ব্যবহার

মানুষের খাদ্য হিসেবে : বাংলাদেশে মূলত বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার খেয়ে থাকে। তবে ঢাকা ছাড়াও অন্যান্য উপকূলীয় শহরগুলো যেমন খুলনা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের বিভিন্ন রেস্টুরেন্টেও বিদেশী ও দেশী পর্যটকদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

চিংড়ি হ্যাচারি, পোল্ট্রি ও ফিশ ফিড ইন্ডাস্ট্রীতে : শামুক ঝিনুক ও ওয়েস্টার এর খোলস থেকে মাংস বের করে মা চিংড়িকে খেতে দেয়া হয়। এদের খোলস শুকিয়ে গুড়া করে ক্যালসিয়াম এর উৎস হিসেবেও ফিড এর সাথে মিশ্রিত করা হয়। এদের মাংসল অংশ প্রোটিনের এক অনন্য উৎস হওয়ায় ফিড তৈরিতে মাছের পরিবর্তে এই অংশ ব্যবহার করা যায়।

চুন, অলংকার ও শো-পিস তৈরিতে : চুন তৈরিতে প্রচুর পরিমাণে শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার এর খোলস ব্যবহার করা হয়। শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার দিয়ে বিভিন্ন রকমের অলংকার তৈরি করা হয়। বিশেষ করে কক্সবাজার অঞ্চলে এর খুব চাহিদা রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন শো-পিস যেমন খোলসে নাম, ফুল, ফল বা নকশা এঁকে অথবা খোদাই করে তৈরি করা হয়।

চাষ ব্যবস্থাপনা ও পোনা উৎপাদন

খাবার হিসেবে শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়তার কারণ হলো এতে প্রোটিন, আয়রন, স্বল্প চর্বি এবং মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার অ্যামাইনো এসিড এর উপস্থিতি। প্রকৃতি থেকে আহরণ করায় দিন দিন এর সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধির দরুন বিভিন্ন দেশে চাষ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে। বাংলাদেশের মাটি ও পানির গুণাগুণ শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার চাষ উপযোগী হওয়ায় এগুলো চাষ করার মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

শামুক চাষ

পুকুর প্রস্তুতকরণ : শামুক চাষের জন্য প্রাথমিক বিষয় হল জায়গা নির্বাচন। এমন একটি স্থান বা জায়গা চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ গাছ আছে যা শামুকের খাদ্য ও আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করবে। মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার মতই পুকুরের তলদেশ শুকিয়ে নিতে হবে। পুকুরে যদি কোন পোকা বা ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া থেকে থাকে তবে পুকুর ভালোভাবে শুকিয়ে সার ও চুন প্রয়োগ করতে হবে। তবে শামুকের জন্য সহজে গুরিয়ে যায় এমন মাটি এবং মাটির পিএইচ ৫.৮ থেকে ৭.৫ এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ হলে ভালো হয়। অধিক কাঁদাযুক্ত মাটিতে এদের ডিম পাড়তে এবং চলাচল করতে অসুবিধা হয়। গাছ এবং মাটি আর্দ্র থাকলে এদের চলাচল করতে খুব সহজ হয় এবং পাতা খেয়ে এরা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে তাই পরিবেশ আর্দ্র হলে এদের জন্য ভালো হয়।

মজুদকরণ : বিভিন্ন নদী, খাল-বিল, পুকুর বা ডোবা থেকে সংগ্রহ করে প্রস্তুতকৃত পুকুরে প্রতি শতাংশে প্রায় ২৫০ গ্রাম শামুকের পোনা মজুদ করতে হবে। শামুকের বৃদ্ধির জন্য পুকুরে কম্পোস্ট, পাতা, ফুল এবং ফল খাবার হিসেবে দেয়া যেতে পারে। তবে অবশ্যই তা সমস্ত পুকুরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।

প্রজনন ও ডিম উৎপাদন : শামুক দুই ধরণের লিঙ্গ ধারণ করে বিধায় প্রজনন এর সময় প্রয়োজন মত লিঙ্গ পরিবর্তন করে প্রজননে অংশ গ্রহন করে। সাধারণত এরা বসন্তের শেষে এবং গ্রীষ্মের শুরুতে প্রজনন করে থাকে। প্রজননের পর ডিম পাড়ে। তবে যেখানে ডিম পাড়বে সেই জায়গাটি অবশ্যই কমপক্ষে ২ ইঞ্চি উচ্চতা সম্পন্ন মাটি হতে হবে এবং সেই জায়গায় কোন প্রকার পিপড়া বা অন্য কোন পোকামাকড় থাকলে তা অবশ্যই সরিয়ে ফেলতে হবে নয়ত ডিম খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। মাটির তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং অন্যান্য গুণাগুণের উপর ডিম পাড়া নির্ভরশীল। ডিম পাড়ার পর শামুকের শরীরের ওজন কমে যায় ফলে দূর্বল হয়ে মারা যেতে পারে তাই পরিমিত পরিমাণে খাবার দিতে হবে। শামুককে সংক্রামক রোগ মুক্ত রাখতে হলে অবশ্যই প্রতিদিনের দেয়া খাবার পরিস্কার করতে হবে। নয়ত খুব সহজেই শামুক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে। চাষকৃত শামুক ৬-৭ মাস পর পুকুর থেকে সংগ্রহ করা যায়। বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে শামুক সংগ্রহ করা যায়।

- লোহা বা প্লাষ্টিক পাইপের মাধ্যমে
- বাশেঁর খুটির মাধ্যমে
- জাল টানার মাধ্যমে
- তাল পাতা ব্যবহার করে।

ঝিনুক চাষ ব্যবস্থাপনা

শামুকের ন্যায় ঝিনুকও এদেশের সাধারণ মানুষের জন্য প্রচলিত খাবার নয়। তাই ঝিনুক চাষ এর প্রচলন নেই। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে ঝিনুকেরও বেশ চাহিদা রয়েছে। এটিকে চাষ করার মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব।

পুকুর প্রস্তুতি : মাছ চাষের জন্য পুকুর যেভাবে প্রস্তুত করা হয় ঠিক তেমন করেই ঝিনুক চাষের পুকুর প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়। পুকুরের তলদেশের মাটি অবশ্যই ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ হতে হবে, তাহলে ঝিনুকের বৃদ্ধি দ্রুত পাবে। পুকুরে পানি থাকলে পুকুরের তলদেশ ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর পুকুরে চুন দিয়ে তার ২-৩ দিন পর পুকুরে পানি দিতে হবে। পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রতি শতকে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ১২৫ গ্রাম টিএসপি এবং ৫ কেজি হারে জৈব সার ১৫ দিন অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।

মজুদকরণ : প্রকৃতি থেকে ঝিনুক সংগ্রহ করে পুকুরে প্রতি শতকে ২৫০টি করে মজুদ করা হয়। এরা মূলত প্লাঙ্কটন খায় তাই পুকুরে যেন প্রাকৃতিক ভাবে প্লাঙ্কটন বেড়ে উঠে সেজন্য পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করা হয়। ফুলকার মাধ্যমে এরা পানিতে বিদ্যমান ফাইটোপ্লাঙ্কটন ও জুপ্লাঙ্কটন ছেঁকে খায়। যেহেতু ঝিনুকের জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে অবশ্যই পোষক হিসেবে মাছের প্রয়োজন সেহেতু প্রতি শতাংশে ৫০ টি করে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ যেমন: বিভিন্ন কার্প জাতীয় মাছ, পাবদা, গুলসা, শিং, টাকি ইত্যাদি পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে।

প্রজনন : ঝিনুকের ক্ষেত্রেও বাইরে থেকে পুরুষ বা স্ত্রী ঝিনুক চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তবে প্রজনন মৌসুমে এরা প্রজনন করে একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে। পুরুষ ঝিনুকটি সাইফনিং পদ্ধতিতে স্পার্ম পানিতে ছেড়ে দেয় এবং স্ত্রী ঝিনুক একই প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে তার খোলসের ভিতর প্রবেশ করায়। নিষেক প্রক্রিয়া স্ত্রী ঝিনুকের দেহে হয়ে থাকে। স্ত্রী ঝিনুকটি লার্ভা হওয়া পর্যন্ত তার দেহে লালন করে। লার্ভায় রুপান্তরিত হলে স্ত্রী ঝিনুকের দেহ থেকে আবার সাইফনিং প্রক্রিয়ায় ছেড়ে দেয় এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মাছের গায়ে অথবা কানকুয়াতে আটকে থাকে। যতদিন পর্যন্ত না লার্ভাগুলো চলাচল করতে পারে ততদিন পর্যন্ত এরা মাছের সাথে প্যারাসাইট হিসেবে লেগে থাকে। এই জন্যে ঝিনুকের জীবনের এই ধাপটিকে প্যারাসাইটিক

ধাপ বলে। অন্য দিকে সামুদ্রিক ঝিনুকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঝিনুকের যে কানকুয়া তা ছোট মাছের মত দেখতে হওয়ায় শিকারী মাছ গুলোকে আকৃষ্ট করে। যখনই মাছটি ঝিনুকের খুব কাছে চলে আসে তখন সে তার খোলসের সাহায্যে মাছটিকে চেপে ধরে রাখে এবং লার্ভাগুলোকে মাছের ভিতরে ঠেলে দেয়। এই লার্ভাগুলোকে বলা হয় গ্লোচিডিয়া। এরা শীতের শুরুতে এবং গ্রীস্মের শুরুতে প্রজনন করে থাকে। প্রজননের পর প্রায় ১ থেকে ১.৫ বছর পর ঝিনুক সংগ্রহ করা যায়।

ওয়েস্টার চাষ

শামুক, ঝিনুকের পাশাপাশি ওয়েস্টারেরও রয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য। ঝিনুকের চেয়ে শামুক বা ওয়েস্টার দ্রুত বৃদ্ধি পায় বলে এর চাষ পদ্ধতি অত্যন্ত লাভজনক। তবে শামুক বা ঝিনুক মিঠা ও নোনা উভয় পানিতে চাষ করা গেলেও ওয়েস্টার চাষ করতে লবণাক্ত পানির প্রয়োজন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওয়েস্টার চাষ করা যায়।

চাষ পদ্ধতি : ওয়েস্টার প্রাকৃতিকভাবে মোহনা এবং নোনা পানিতে বেড়ে ওঠে। তবে চাষের ক্ষেত্রে অবশ্যই পানির তাপমাত্রা, লবণাক্ততা এবং গুণগত মান নিরীক্ষা করতে হয় যেন প্রজনন যথাসময়ে সংঘটিত হতে পারে। ওয়েস্টার চাষের প্রথম ধাপ হল ব্রুড কন্ডিশনিং। এই ব্রুড থেকেই পরবর্তীতে গ্যামেট এবং গ্যামেট থেকে লার্ভা উৎপন্ন হয়। প্রকৃতিতে খুব অল্প সময়ের জন্য একই সাথে পরিপক্ক হয় এবং একই সময়ে প্রজনন করে যেন সর্বোচ্চ এবং উর্বর লার্ভা উৎপন্ন হয়। তবে সারা মৌসুম জুড়ে যেন প্রজনন করতে পারে সে উদ্দেশ্যে পরিপক্ক ওয়েস্টার নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা হয়। তবে সংগৃহীত স্থানে অবশ্যই তাপমাত্রা, লবণাক্ততা এবং রিসার্কুলেটিং পানির নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে চাষীরা গরম ও শীতকাল এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যেন ওয়েস্টার মনে করে যে তার প্রজননের সময় হয়েছে। ফলে চাষীরা যে কোন সময় পোনা উৎপাদন করতে পারে।

যখনই কোন চাষী ওয়েস্টার এর লার্ভা উৎপাদন করতে চাইবে তখনই তারা ওয়েস্টার এর একটি গ্রুপ বা দল তৈরি করবে ও দলটিকে একটি ট্রের মধ্যে পানি সহ রাখবে। পরে সেই ট্রেটিকে দ্রুত উত্তপ্ত এবং দ্রুত ঠান্ডা করার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রজননের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রজনন শুরু হওয়ার সাথে সাথে ট্রে থেকে উঠিয়ে অন্য আরেকটি ট্রেতে রাখতে হবে ততক্ষণ যতক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে গ্যামেট বের করে দেয়। নিষেক ঘটানোর জন্য ডিম ও স্পার্ম মিশ্রিত করা হয়।

লার্ভার জন্য ব্যবহৃত ট্যাঙ্ক অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে। পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখতে হবে কেননা কিছু লার্ভা উষ্ণ পানিতেও দ্রুত বাড়ে। লার্ভা ডিম থেকে বের হয়ে আসার পর থেকেই এদের প্লাংকটন অথবা চাষ করা এলজি খাওয়াতে হবে। প্রতিদিন পানি পরিবর্তন করতে হবে। দুই সপ্তাহ পর লার্ভার পা তৈরি হয় যা মাইক্রোস্কোপে দেখা সম্ভব। এরপর এদেরকে কোন ওয়েস্টার এর খোলস দেয়া হয় অথবা ছেড়ে রাখা হয়। তবে এরা অপর ওয়েস্টার এর গায়েই প্রাকৃতিকভাবে লেগে থাকে বলে কৃত্রিম ভাবেও খোলস দেয়া হয় যেন বৃদ্ধি ভালোভাবে হয়। লার্ভা যখন ঠিকভাবে স্যাটল হয় তখন একে স্প্যাট বলে। তিনটি পদ্ধতিতে মূলত ওয়েস্টার লালন করা যায়-

প্রথম পদ্ধতি : এই ক্ষেত্রে স্প্যাটগুলোকে উপকূলীয় এলাকায় ওয়েস্টার বেড এর উপর ছড়িয়ে দিতে হয় যেন এরা প্রাকৃতিকভাবেই বেড়ে ওঠে। পরবর্তীতে বেড়ে ওঠার পর এদের ড্রেজিং করে সংগ্রহ করতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : এই ক্ষেত্রে স্প্যাটগুলোকে রেক / ব্যাগ / খাঁচায় রেখে লম্বা দড়ির সাহায্যে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। লালন করার সময় এদের বৃদ্ধি পরীক্ষা করতে হয়। বড় হলে অর্থাৎ বাজারে নেয়ার মত হলে লিফটিং প্রক্রিয়ায় দড়ি টেনে সংগ্রহ করা হয়।

তৃতীয় পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে বিশেষ এক ধরণের ট্যাংক ব্যবহার করতে হবে। ট্যাংকে পানির গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ, খাবার প্রদান, নোনা পানি দেয়া এবং পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করতে হবে। লবণাক্ততা যেন পরিমিত পরিমাণে থাকে সেদিকটাও খেয়াল রাখতে হবে। সমুদ্রের পানিতে যে ক্যালসাইট এবং এরাগোনাইট থাকে তা ওয়েস্টারকে দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ব্যবহৃত সকল কিছু যেন জীবাণুমুক্ত থাকে।

এছাড়াও অপর একটি পদ্ধতি হল, প্রকৃতি থেকে ওয়েস্টার এর স্প্যাট সংগ্রহ করে রাখে অনেক চাষী। সংগৃহীত স্প্যাট যখন বৃদ্ধি পেয়ে কয়েক মিলিমিটার হয় তখন যেখানে লেগে থাকে সেখান থেকে সরিয়ে লালন পালন করার জন্য আলাদা করা হয়। ওয়েস্টার হ্যাচারি অবশ্যই উপকূলীয় অঞ্চলে স্থাপন করতে হবে। বসন্তের সময় যখন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ হয় তখন ওয়েস্টার ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে লার্ভা বের

হলে তাদের এক ধরণের গোলাকার সিস্টার্ন এ রেখে এলজি খাওয়ানো হয়। উপকূলীয় পরিবেশের ওপর নির্ভর করে মূলত ওয়েস্টার চাষ করা হয়। প্লাষ্টিক নেট ব্যাগে করে ওয়েস্টার ঝুলিয়ে দেয়া হয়। কম গভীর অঞ্চল থেকে বেশী গভীর অঞ্চল উভয় পরিবেশই ওয়েস্টার চাষ এর জন্য উপযোগী। এর পর ৬-৭ মাস পর ওয়েস্টার সংগ্রহ করা হয়।

বাংলাদেশে অপ্রচলিত জলজ সম্পদের মধ্যে শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার অন্যতম। যদিও খাবার হিসেবে দেশে প্রচলন নেই তবুও পুষ্টিগুণের বিচারে ও আন্তর্জাতিক চাহিদার নিরিখে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশে সাধারণত উপকূলীয় ও গ্রামাঞ্চলের মানুষ শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার সংগ্রহ করে তা খুচড়া বিক্রেতার মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পে বিক্রি করে। বহুকাল ধরে চলে আসা এ প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি থেকে এদের প্রাপ্যতা দিন দিন কমে আসছে। এভাবে একটা সময় প্রকৃতি থেকে এরা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। এদের ছাঁকন প্রক্রিয়ায় খাবার গ্রহণের ফলে প্রকৃতিতে বিশেষ করে জলজ ইকোসিস্টেম দূষণ মুক্ত থাকে। বিশেষ করে মাছ চাষের সময় পুকুরের তলদেশে যে সকল বর্জ্য তৈরি হয় সেগুলো দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ঝিনুক ও শামুক। এক কথায় বলা যায় যে, দূষণমুক্ত পরিবেশের পরিমাপক হল শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার। আমাদের উপকূলীয় এলাকা, মিঠাপানির বিভিন্ন জলাশয় এবং মাছ চাষের জন্য যে সকল পুকুর রয়েছে তা শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার চাষের জন্য খুবই উপযোগী। উল্লেখ্য যে, ঝিনুকের জীবন চক্র সম্পন্ন করতে অবশ্যই পোষক হিসেবে মাছের প্রয়োজন আবার মাছ চাষেও এরা কোন বিঘ্ন ঘটায় না। মাছের পাশাপাশি একই পুকুরে ঝিনুক ও শামুক চাষ করা সম্ভব, ফলে আলাদা করে চাষের জন্য নতুন পুকুরের প্রয়োজন হয় না। চাষ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হলে এবং বিদেশে রপ্তানী করতে পারলে দেশের রপ্তানী পণ্য যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি দেশীয় বিভিন্ন চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। ফলে দেশের অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হবে।

চিত্র ১. বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মিঠাপানির শামুক ও ঝিনুক

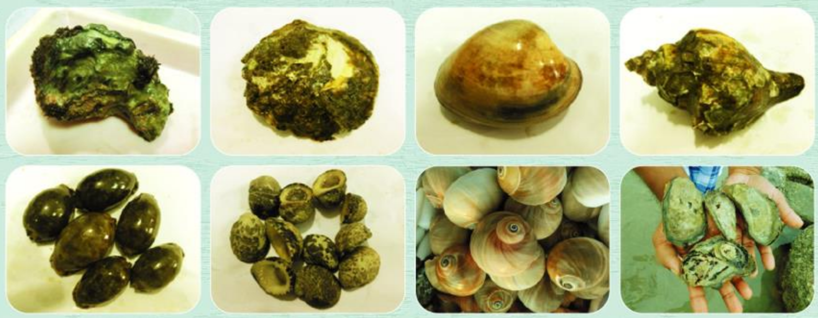

চিত্র ২. বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামুদ্রিক শামুক ও ঝিনুক

কুচিয়া মাছের প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনা

চিংড়ি ও কাঁকড়ার পরই রপ্তানি বাণিজ্যে কুচিয়া মাছের অবস্থান। আশির দশক হতে বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির মাধ্যমে কুচিয়ার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশের জলজ পরিবেশ কুচিয়া চাষের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। এদেশের খাল-বিল, পুকুর, হাওর-বাঁওড়, বন্যা প্লাবিত অঞ্চল ও ধান ক্ষেতে কুচিয়া পাওয়া যায়। কুচিয়া বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে পারে বিধায় অল্প অক্সিজেনে বাঁচতে পারে এমনকি পানি ছাড়া ২/৩ দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে। এ কারণে অল্প পানিতে এবং অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়। বাংলাদেশে থেকে *Monopterus cuchia* সহ আর তিনটি প্রজাতি যেমন: বামস বা বানেহারা (*Anguilla bengalensi*), সাপ বাইম (*Pisodonophis cancrivorus*) এবং খারু (*Pisodonophis bor*) কুচিয়া নামে বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। প্রতি বছর প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে প্রচুর পরিমাণে কুচিয়া আহরণ করে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কুচিয়া মাছ রপ্তানী করে ১৪,৯৭,৮০০০ ডলার আয় করে। সাপের মত দেখতে হলেও পুষ্টিমানে ভরপুর ও ঔষধি গুণাগুণ সম্পন্ন কুচিয়া মাছের বিশ্ববাজারে ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক উৎস থেকে এর আহরণের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কুচিয়া মাছের বৈশিষ্ট্য : সাপের মত দেখতে হলেও কুচিয়া একটি মাছ। কুচিয়া মাছের শরীর লম্বা বেলনাকৃতির। এদের শরীর থেকে স্লাইম নি:সরিত হয় বিধায় শরীর পিচ্ছিল হয়ে থাকে। বিপদের সময়ে সামনে এবং পিছনে চলাচল করতে পারে। যদিও কুচিয়া মাছকে আঁইশবিহীন মনে হয় প্রকৃতপক্ষে এই মাছের গায়ে ক্ষুদ্রাকৃতির আঁইশ বিদ্যমান যার বেশীরভাগ অংশই চামড়ার নীচে সজ্জিত থাকে।

কুচিয়া আদিবাসী সমাজ ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির জনপ্রিয় সুস্বাদু খাদ্য। কুচিয়া মাছে আমিষের পরিমাণ বেশি। ভক্ষণযোগ্য প্রতি ১০০ গ্রাম কুচিয়া মাছে প্রায় ১৮.৭ গ্রাম প্রোটিন, ০.৮ গ্রাম চর্বি, ২.৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১৪০০ মাইক্রো গ্রাম ভিটামিন, ১৮৫ গ্রাম ক্যালসিয়াম রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় প্রতি ১০০ গ্রাম কুচিয়ায় শক্তির পরিমাণ ৩০৩ কিলোক্যালরি যেখানে কার্প জাতীয় মাছে পাওয়া যায় মাত্র ১১০ কিলোক্যালরি। উপজাতীয় সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে এই মাছ খেলে শারীরিক দূর্বলতা, রক্তশূন্যতা, এজমা, রক্তক্ষরণ এবং ডায়েবেটিস ইত্যাদি রোগসমূহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন গবেষণার প্রকাশিত প্রতিবেদনও অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের এই বিশ্বাসের সাথে একমত পোষণ করে। তাছাড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠী কুচিয়া ব্যাথানাশক, রক্ত উৎপাদক ও হজমশক্তি বর্ধনকারী হিসেবে খেয়ে থাকে।

এক সময় এদেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে কুচিয়ার প্রাপ্যতা থাকলেও বর্তমানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে এর প্রাপ্যতা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হাতছানিতে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী লোভের বশবর্তী হয়ে অতিরিক্ত আহরণে ফলে বাংলাদেশের জলাশয় থেকে কুচিয়া মাছ আজ বিলুপ্তির পথে। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক উৎসের উপর নির্ভর না করে সম্পূরক খাদ্য এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করে উৎপাদন করা সম্ভব হলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ধারা অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাসহ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

কুচিয়া মাছের নিয়ন্ত্রিত প্রজনন কৌশল

প্রজনন মৌসুমে সাধারণত স্ত্রী কুচিয়া মাছের গায়ের রং গাঢ় হলুদ বর্ণের এবং পুরুষ কুচিয়া মাছ কালো বর্ণের হয়ে থাকে। যেহেতু কুচিয়া মাছ লিঙ্গ পরিবর্তন করতে সক্ষম তাই শুধুমাত্র বাহ্যিক বর্ণের উপর ভিত্তি করে পুরুষ ও স্ত্রী কুচিয়া মাছকে আলাদা করা সম্ভব নয়। তবে প্রজনন মৌসুমে স্ত্রী কুচিয়া মাছের জননাঙ্গ কিছুটা স্ফীত হয় ও ডিম ধারণ করার কারণে পেটের দিক যথেষ্ট ফোলা থাকে। পুরুষ

কুচিয়া মাছ স্ত্রী কুচিয়া মাছের তুলনায় আকারে ছোট হয়ে থাকে। কুচিয়া মাছ বছরে একবার মাত্র প্রজনন করে থাকে। প্রকৃতিতে ২০০-৪০০ গ্রাম ওজনের কুচিয়া মাছ পরিপক্ক হয়ে থাকে এবং গড়ে ২৫০-৬৫০টি ডিম ধারণ করে। কুচিয়া ডিম পাড়ার জন্য পুকুরে জিগ-জাগ গর্ত করে থাকে। এপ্রিল মাসে শেষ সপ্তাহ থেকে জুন মাসের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত কুচিয়া মাছ প্রজনন কার্য সম্পাদন করে থাকে। কুঁচিয়া নিজেদের তৈরি গর্তে ডিম দেয় এবং সেখানেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এই সময় মা কুচিয়া খুব কাছে থেকে ডিম পাহাড়া দেয় এবং বাবা কুঁচিয়া আশপাশেই অবস্থান করে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়া থেকে শুরু করে ডিম্বথলি নি:শোষিত না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চাগুলোকে মা কুচিয়া শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ

পুকুরের আয়তন ৩-১০ শতাংশ হলে ভাল। যেহেতু কুচিয়া মাটির অনেক নীচ পর্যন্ত গর্ত করে এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে চলে যায় সেহেতু নির্ধারিত পুকুরে কুচিয়াকে রাখার জন্য পুকুরের তলদেশ এবং পাড় পাকা করা সম্ভব হলে ভাল। নাহলে গ্লাস নাইলনের নেট, রঙ্গিন বা মোটা পলিথিন দিয়ে পুকুরের তলদেশ এবং পাড় ঢেকে দিতে হবে। গ্লাস নাইলনের নেট, রঙ্গিন বা মোটা পলিথিনের উপর কমপক্ষে ২-৩ ফুট মাটি দিতে হবে। পুকুরের একপাশে কম্পোস্টের স্তুপ অথবা সারা পুকুরে ১ ইঞ্চি পরিমাণ কম্পোস্ট দিতে হবে। পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে কচুরিপানা থাকতে হবে, বিশেষ করে প্রজনন মৌসুমে কচুরীপানা পুকুরের ৩/৪ ভাগের বেশী পরিমাণে থাকতে হবে। যেহেতু কুচিয়া কম গভীরতা সম্পন্ন পুকুর বা বিলে পাওয়া যায় তাই তাদের উপযোগী পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রজননকালে পানির গভীরতা সর্বোচ্চ ১ ফুট পর্যন্ত রাখা উত্তম।

ব্রুড কুচিয়া মাছ সংগ্রহ ও পরিচর্যা

ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে ২৫০-৩৫০ গ্রাম ওজনের ব্রুড কুচিয়া মাছ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহিত ব্রুড কুচিয়াকে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো জন্য হ্যাচারিতে বা পুকুরে স্থাপিত হাপায় রেখে ৫-৭ দিন পরিচর্য়া করতে হবে। আহরণ পদ্ধতির জটিলতার কারণে সংগৃহিত অধিকাংশ কুচিয়ার মুখে আঘাত থাকে। এছাড়া সংগ্রহকারীরা দীর্ঘক্ষণ অধিক ঘনত্বে চৌবাচ্চায় বা ড্রামে কুচিয়া মজুদ রাখে বিধায় পেটের নিচের দিকে ঝোপ ঝোপ রক্ত জমাট বাঁধা অবস্থায় থাকে। আঘাতপ্রাপ্ত বা শরীরে রক্ত জমাট থাকা ব্রুড কুচিয়াকে আলাদা করে আঘাতের পরিমাণ বিবেচনা করে ০.২-০.৫ মিলি. এন্টিবায়োটিক, রেনামাইসিন প্রয়োগ করতে হবে। স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনা করে প্রয়োজনে একই হারে ২য় বার এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা যেতে পারে। সুস্থ সবল ব্রুড কুঁচিয়ার পুরুষ এবং স্ত্রী সনাক্ত করার পর ১৫০-২৫০ গ্রাম ওজনের পুরুষ কুঁচিয়া এবং ২৫০-৩৫০ গ্রাম ওজনের স্ত্রী কুঁচিয়া মাছকে প্রস্তুতকৃত পুকুরে ১:২ অনুপাতে শতাংশে ৩০টি করে মজুদ করতে হবে।

মজুদকৃত কুঁচিয়া মাছকে খাদ্য হিসেবে জীবিত মাছ ও শামুক সরবরাহের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। ১০০ গ্রাম সম্পূরক খাদ্যে মাছের মন্ড (৫০%), চেওয়া মাছ থেকে তৈরি শুটকী থেকে প্রস্তুতকৃত ফিসমিল (৪০%), কুঁড়া (৫%) এবং আটা (৫%) দিতে হবে। কুঁচিয়া নিশাচর প্রাণি বিধায় প্রতিদিন সন্ধার পর নির্ধারিত ট্রেতে খাদ্য প্রয়োগ করা উত্তম।

বেবি কুঁচিয়া সংগ্রহ

প্রজননের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হলে মে-জুন মাসের মধ্যে ব্রুড প্রতিপালন পুকুর থেকে পোনা সংগ্রহ করা সম্ভব। মূলত:ডিম্বথলি নি:শোষিত হওয়ার পর পোনাগুলো বাবা-মায়ের আশ্রয় ছেড়ে কচুরীপানার শিকড়ে উঠে আসে ও সেখানে

খাদ্যের সন্ধান করে। মে মাসের ১ম সপ্তাহে কিছু পরিমাণে কচুরীপানা উঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পোনাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হলে প্রাথমিকভাবে গ্লাস নাইলনের তৈরি হাপার মাধ্যমে কচুরীপানা সংগ্রহ করে পুকুর পাড়ে বা সমতল স্থানে উঠিয়ে আনতে হবে। ১৫-২০ মিনিটের জন্য হাপার মুখ হালকাভাবে বেঁধে রাখতে হবে। অতপর হাপার বাঁধন খুলে আলতোভাবে উপর থেকে কচুরীপানা ঝেড়ে সরিয়ে ফেলতে হবে। ইতোমধ্যে জমা হওয়া পোনাগুলোকে সংগ্রহ করে প্রাথমিকভাবে হ্যাচারিতে বা পুকুরে পূর্ব থেকে স্থাপিত ফিল্টার নেটের হাপায় মজুদ করতে হবে। যেহেতু সকল মাছ একই সময়ে পরিপক্ক হয় না তাই মে মাসে কচুরীপানা থেকে পোনা সংগ্রহের পর পর্যাপ্ত পরিমাণে কচুরীপানা পুনরায় দিতে হবে। ১৫ দিন অন্তর কচুরীপানা পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং একই পদ্ধতিতে পোনা সংগ্রহ করতে হবে।

পোনা লালন-পালন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

কুঁচিয়ার পোনা স্টীলের ট্রে বা সিমেন্টের চৌবাচ্চায় বা পুকুরে ফিল্টার নেটের হাপায় লালন-পালন করা যায়। ট্রে বা চৌবাচ্চা বা হাপা আয়তাকার বা বর্গাকার হতে পারে। সাধারণত মাছের ক্ষেত্রে ৩টি অর্থাৎ রেণু পোনা, ধানী পোনা এবং অঙ্গুলি পোনা পর্যায়ে পৃথক পৃথক ভাবে পরিচর্যা করা হয়ে থাকে। কুঁচিয়ার পোনা ৩টি ধাপে প্রতিপালন করতে হয়। ট্রে বা চৌবাচ্চায় বা হাপায় কুঁচিয়ার পোনা লালন-পালনের ক্ষেত্রে ওজনের ওপর ভিত্তি করে ধাপে ধাপে খাদ্য পরিবর্তন করতে হবে। কুঁচিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ পছন্দ করে বিধায় প্রতিটি ধাপে পোনা মজুদের পরপরই ঝোপালো শিকড়যুক্ত কচুরীপানা কিছু পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে। যেহেতু ১ম ও ২য় ধাপের পোনার আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে, সেহেতু কচুরীপানা সংগ্রহ করে সহজেই পোনা নমুনায়ন করা সম্ভব। কুঁচিয়া মাছ স্বপ্রজাতিভোগি (Cannibalistic) প্রাণি বিধায় প্রতিটি ধাপে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকালীন সময়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ও দুর্বল পোনাগুলোকে আলাদা করতে হবে।

১ম ধাপ অর্থ্যাৎ বেবি কুচিয়া/গ্লাস ঈল প্রতিপালন : ডিম্বথলি নি:শোষিত হওয়া পোনাকে বেবি কুচিয়া বা গ্লাস ঈল বলা হয়। বেবি কুচিয়ার গায়ের রং গাঢ় বাদামী বা কালো বর্ণের হয়। এই পর্যায়ের পোনা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে ৪০০-৫০০টি কুঁচিয়ার পোনা মজুদ করা যায়। বেবি কুঁচিয়া মজুদের পর পর্যাপ্ত পরিমাণে জুপ্লাংটন সরবরাহ করতে হবে এবং বেবি কুঁচিয়া মজুদের ২-৩ দিন পর সম্ভব হলে রাঁজপুঁটি অথবা যে কোন মাছের সদ্য প্রস্ফুটিত রেণু সরবরাহ করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। তবে জুপ্লাংটন সরবরাহ অব্যহত রাখতে হবে। ৩-৪ দিন অন্তর পোনার স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করে অপেক্ষাকৃত ছোট পোনাগুলোকে আলাদা করতে হবে।

২য় পর্যায়ে কুঁচিয়ার পোনা প্রতিপালন : সাধারণত: ১০-১৫টি পোনার ওজন ১ গ্রাম হলে এই পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়। এই ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে ১৫০-২০০টি কুঁচিয়ার পোনা মজুদ করা যায় এবং পোনাকে জীবিত টিউবিফেক্স সরবরাহ করতে হবে। এজন্য ট্রে বা চৌবাচ্চায় টিউবিফেক্সের বেড তৈরি করতে হবে। তবে হাপায় পোনা লালন-পালনের ক্ষেত্রে টিউবিফেক্স কুচি কুচি করে কেটে সরবরাহ করতে হবে। পাঁচ হতে সাত দিন পর পর পোনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে অপেক্ষাকৃত ছোট পোনাগুলোকে আলাদা করতে হবে।

৩য় পর্যায়ে কুঁচিয়ার পোনা প্রতিপালন : সাধারনত: ৪-৫ গ্রাম ওজনের পোনা এই পর্যায়ের অর্ন্তভূক্ত হয়। এই ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে ৭৫-১০০টি কুঁচিয়ার পোনা মজুদ করা যায়। খাদ্য হিসেবে জলজ পোকা (হাঁস পোকা) জীবিত বা মৃত অবস্থায় সরবরাহ করা যেতে পারে। পাশাপশি সম্পূরক খাদ্য হিসেবে পোনার দেহ ওজনের ১০-১৫% পর্যন্ত মাছের ভর্তা সন্ধ্যার পর সরবরাহ করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। তবে এই সময় ট্রে বা চৌবাচ্চায় এটেল বা দোঁ-আশ মাটি দিয়ে পুকুরের ন্যায় পাড় তৈরি করে প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করলে কুঁচিয়া স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। বাজার উপযোগী কুঁচিয়া উৎপাদনের জন্য পোনার ওজন ১৫-২০ গ্রাম হলে ক্রুড প্রতিপালনের ন্যায় একই পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত পুকুরে মজুদ করতে হবে। তবে ৪০-৫০ গ্রাম ওজনের হলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

মজুদপূর্ব কুঁচিয়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ উপযোগী পোনা প্রাপ্তি সম্ভব না হলে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সনাতন পদ্ধতিতে কুঁচিয়া সংগ্রহ করা হলে আঘাতজনিত কারণে মাছের শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। সময়মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা না গ্রহণ করলে এ ক্ষত মাছের মৃত্যুর কারণও হতে পারে। কুঁচিয়া সংগ্রহের পরই পাঁচ পিপিএম পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট দিয়ে ১ ঘন্টা গোসল করিয়ে মাছগুলোকে পর্যবেক্ষণ হাপা/সিস্টার্ন কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। পরে সুস্থ, সবল মাছগুলোকেই কেবলমাত্র মজুদ করতে হবে।

পোনা মজুদ : মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য মার্চ অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে উৎপাদিত পোনা / প্রকৃতি থেকে ৪০-৫০ গ্রাম ওজনের কুঁচিয়া মাছের পোনা সংগ্রহ করে

মজুদপূর্ব যথাযথ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করার পর প্রতি বর্গফুটে ১০টি হারে সুস্থ সবল পোনা সিস্টার্ন/নেট পরিবেষ্টিত পুকুরে মজুদ করতে হবে। তবে মজুদের পূর্বে সিস্টার্ন/নেট বেষ্টিত পুকুরে হেলেঞ্চা দিতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা : রাক্ষুসে স্বভাবের হলেও কুঁচিয়া সম্পূরক খাদ্য গ্রহণ করে। চাষকালীন পুরো সময়জুড়ে কুঁচিয়া মাছকে প্রতিদিন দেহ ওজনের ৩-৫% হারে খাবার প্রয়োগ করতে হবে। মাছের আকার এবং জলবায়ুর ওপর, বিশেষত তাপমাত্রার তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা উচিত। গবেষণায় দেখা যায়, কুঁচিয়া ২০ থেকে ৩৫° সে. পর্যন্ত তাপমাত্রায় খাবার গ্রহণ করে। তবে ২৫ থেকে ৩০° সে. তাপমাত্রায় বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কুঁচিয়ার সম্পূরক খাদ্য হিসেবে মাছের ভর্তা, অটো রাইসমিলের কুঁড়া, ফিশমিল ও আটা মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। খাবার অপচয় রোধে ফিডিং ট্রেতে খাবার সরবরাহ করা উত্তম। সম্পূরক খাদ্য ছাড়াও মাছের জীবিত পোনা সরবরাহ করলে ভালো উৎপাদন আশা করা যায়। নিম্ন ছকে কুঁচিয়ার ১০০০ গ্রাম সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন উপকরণের তালিকা দেয়া হলো :

সারণি ১. কুঁচিয়ার ১০০০ গ্রাম সম্পূরক খাদ্যে বিভিন্ন উপকরণের পরিমাণ

খাদ্যের উপকরণ	পরিমাণ (গ্রাম)	আনুমানিক মূল্য (টাকা)
মাছের ভর্তা	৫০০.০০	৩০.০০
ফিশমিল	৪০০.০০	৩২.০০
কুঁড়া	৫০.০০	১.০০
আটা	৫০.০০	১.৫০
মোট	**১০০০.০০**	**৬৪.৫০**

আহরণ ও উপাদান : মাছের ওজন ও বাজারে চাহিদার ওপর নির্ভর করে কুঁচিয়া আহরণ করতে হবে। সঠিক ব্যবস্থাপনায় ৬-৭ মাস চাষ করলে কুঁচিয়া গড়ে ২০০-২৫০ গ্রাম হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, সিস্টার্ন/নেট পরিবেষ্টিত পুকুরে মাছের বেঁচে থাকার হার ৯০ থেকে ৯৭%। চাষ ব্যবস্থাপনা সঠিক থাকলে শতাংশে ৭০-৭৫ কেজি কুঁচিয়া উৎপাদিত হয়।

সারণি ২. প্রতি শতাংশ পুকুরে কুঁচিয়া চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব

আয়-ব্যয়ের খাত	পরিমাণ (টাকা)
নেট তৈরি বাবদ ব্যয়	১,০০০.০০
পোনার মূল্য (৪০০টি, প্রতিটি ৫/-)	২,০০০.০০
খাদ্য খরচ (১৪৪ কেজি, প্রতি কেজি ৬৪.৫০ টাকা)	৯,২৮৮.০০
বিবিধ খরচ	১,০০০.০০
মোট ব্যয় =	১৩,২৮৮.০০
কুচিয়ার বিক্রয় মূল্য (৭২.০ কেজি, ৩২৫/-প্রতি কেজি)	২৩,৪০০.০০
প্রকৃত আয় =	১০,১১২.০০
আয়-ব্যয়ের অনুপাত =	১:০.৮৩
খাদ্য পরিবর্তন হার (FCR) =	২.০

কুচিয়া পোনা প্রতিপালনে সর্তকতা

- ট্রে বা চৌবাচ্চায় বা হাপায় পোনা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কচুরীপানা অল্প পরিমাণে দিতে হবে
- কচুরীপানার পরিমাণ বেশি হলে নাইট্রোজেনের আধিক্যের কারণে পোনার মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে
- কচুরীপানা তুলে সহজেই পোনার নমুনায়ন করা যায়
- পুকুরে জোঁকের আক্রমণ যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে
- জোঁকের আক্রমণ হলে প্রার্দুভাবের উপর ভিত্তি করে পুকুরে পানি কমিয়ে শতাংশে ২৫০-৩৫০ গ্রাম লবণ প্রয়োগ করে ৭-৮ ঘন্টা পর পানি সরবরাহ করতে হবে
- টিউবিফেক্সের বেড তৈরি করে পোনা প্রতিপালন করলে সম আকারের পোনা পাওয়া যায় এবং এতে পোনার বেঁচে থাকার হারও অনেক বেশি। তবে কোনভাবেই টিউবিফেক্সের বেডে জীবিত হাঁস পোকা সরবরাহ করা যাবে না।

কুচিয়া চাষে সতর্কতা

- হেলেঞ্চা প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন হেলেঞ্চার সঙ্গে কোনো প্রকার ক্ষতিকর পরজীবী চলে না আসে
- হেলেঞ্চার পরিমাণ বেশি হলে মাঝে তা কমিয়ে দিতে হবে। নতুবা নাইট্রোজেনে আধিক্যের কারণে মাছের গায়ে ফোসকা পড়ে যা পরবর্তীতে ঘায়ে পরিণত হতে পারে।
- পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে, রাক্ষুসে স্বভাবের কারণে এক মাছ অন্য মাছকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

কাঁকড়া আহরণ, পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা

আশির দশকে সনাতন পদ্ধতিতে মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে উপকূলে কাঁকড়ার চাষ শুরু। সময়ের পরিক্রমায় চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন ও প্রসার লাভ করে কাঁকড়া চাষ আজ শিল্পে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত শীলা কাঁকড়া চিমটা পা বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় বিদেশে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এদেশের কাঁকড়া চীন, তাইওয়ান, হংকং, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। অতি সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতেও বাংলাদেশের শীলা কাঁকড়ার বাজার সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধির কারণে চাষের পাশাপাশি প্রাকৃতিক উৎস হতে নির্বিচারে মা ও কিশোর কাঁকড়া আহরণের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে উৎপাদিত কাঁকড়ার শতভাগই প্রাকৃতিক উৎস নির্ভর। ফলে কাঁকড়া সম্পদের প্রাকৃতিক মজুদ বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন। তাছাড়া কাঁকড়া আহরণ ও চাষ (মোটাতাজাকরণ) উপকূলীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। তাই কাঁকড়া শিল্পের টেকসইভাবে বিকশিতকরণ এবং প্রাকৃতিক মজুদ সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

কাঁকড়ার জীবন চক্র : প্রাকৃতিক পরিবেশে শীলা কাঁকড়া আধালবনাক্ত পানিতে বৃদ্ধি লাভ করলেও এরা প্রজনন অভিবাসি প্রজাতি। প্রজনন মৌসুমের শুরুতে প্রাপ্ত বয়স্ক শক্ত খোলস বিশিষ্ট পুরুষ এবং নরম খোলস বিশিষ্ট স্ত্রী কাঁকড়ার মিলন ঘটে সুন্দরবন সংলগ্ন মোহনা অঞ্চলে। মিলনের পরে স্ত্রী কাঁকড়া প্রজনন উপযোগি পরিবেশের খোঁজে সাগরের দিকে যাত্রা করে। গভীর সমুদ্রে এরা ডিম দেয় (স্পনিং) এবং ডিমগুলোকে বক্ষদেশের ঢাকনার (এ্যাবডোমিনাল ফ্লাপ) নীচে গচ্ছিত রাখে। এভাবে ১০-১২ দিনে ভ্রূণের উন্নয়ন ঘটে এবং পরিশেষে ডিম থেকে লার্ভি বের হয় (হ্যাচিং) যাকে জইয়া-১ বলে। জইয়া-১ হতে জইয়া-৫ এবং মেগালোপা ধাপ পর্যন্ত সাগরে অবস্থানের পরে ক্রাব-১ (ক্রাব ইনস্টার) ধাপে পরিবর্তিত হয়ে আবার সুন্দরবন বা তৎসংলগ্ন এলাকায় প্রবেশ করে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পূর্ণবয়স্ক কাঁকড়ায় পরিণত হয়।

কাঁকড়ার বিস্তৃতি ও প্রাপ্যতা : শীলা কাঁকড়া এদেশে সারা বছরব্যাপি পাওয়া যায়। শীলা কাঁকড়ার ৪ টি প্রজাতি রয়েছে। এগুলো হলো (*Scylla serrata, S. tranquebarica, S. paramamosain* ও *S. olivacea*)। তবে, বাংলাদেশে প্রাপ্ত শীলা কাঁকড়ার ৯৯% *Scylla olivacea*, বাকি ৩টি প্রজাতির উপস্থিতি ১%, যা দৈবক্রমে পাওয়া যায়। দেশের উপকূলীয় খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বরগুনা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলায় শীলা কাঁকড়ার বিস্তৃতি। বঙ্গোপসাগরের ৫০ মিটার গভীরতা হতে উপকূলীয় অঞ্চলের সুন্দরবন এবং তৎসংলগ্ন জোয়ার-ভাটা বিধৌত মোহনা, নদী, খাড়ি, খাল এবং চিংড়ি ঘেরসমূহে শীলা কাঁকড়ার বিচরণ।

কাঁকড়ার প্রাপ্যতা নিরূপনে প্রতি একক প্রচেষ্টার আহরণ (CPUE) নির্ণয়ে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা এবং কক্সবাজার এলাকায় কাঁকড়া আহরণে নিয়োজিত নৌকা হতে সরাসরি নমুনা সংগ্রহ করে দেখা যায় যে, প্রতি একক প্রচেষ্টায় প্রাপ্যতার দিক থেকে সাতক্ষীরা শীর্ষে (০.০৭৯ টি কাঁকড়া/চারু বা টোপ/ঘন্টা)। ক্রমান্বয়ে খুলনা (০.০৭৮ টি কাঁকড়া/চারু বা টোপ/ঘন্টা), বাগেরহাট (০.০৭৩ টি কাঁকড়া/চারু বা টোপ/ঘন্টা), কক্সবাজার (০.০৫৭ টি কাঁকড়া/চারু বা টোপ/ঘন্টা) এবং সবচেয়ে কম পটুয়াখালী (০.০২৬ টি কাঁকড়া/চারু বা টোপ/ঘন্টা) জেলায় (রেখাচিত্র-১)।

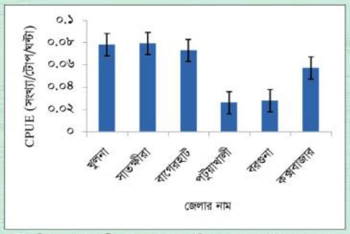

রেখাচিত্র ১. উপকূলীয় জেলাসমূহে প্রতি একক প্রচেষ্টায় (CPUE) আহরিত কাঁকড়ার পরিমাণ।

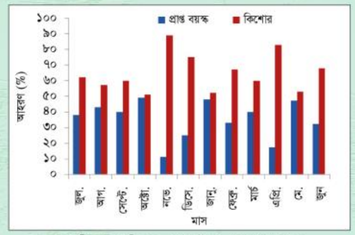

রেখাচিত্র ২. প্রতি একক প্রচেষ্টার আহরণে বয়স্ক ও কিশোর কাঁকড়ার প্রাপ্যতার হার।

রেখাচিত্র ২ এ প্রতি একক প্রচেষ্টার আহরণে প্রাপ্ত বয়স্ক ও কিশোর কাঁকড়ার প্রাপ্যতার হার দেখানো হয়েছে। বছরব্যাপি কিশোর কাঁকড়া আহরণ করা হয়ে থাকে যার পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। সর্বনিম্ন ৫০% কিশোর কাঁকড়া আহরিত হয় অক্টোবর মাসে এবং সর্বোচ্চ ৮৯% নভেম্বর মাসে। তথ্য সংগ্রহে দেখা যায়, আহরিত কিশোর কাঁকড়ার ৬০-৬৫% পুনরায় চাষে/নরম খোলসের কাঁকড়া উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, ১৫-২০% কাঁকড়া পরিবহনে মারা যায় এবং ১০-১৫% কাঁকড়ার উপাঙ্গ পরিবহনের সময় ভেঙ্গে যায় যা পরবর্তিতে মারা যায় বা স্থানীয় বাজারে কম মূল্যে বিক্রয় হয়। মাত্রাতিরিক্ত কিশোর কাঁকড়া আহরণের ফলে প্রাকৃতিক মজুদ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। যা কাঁকড়া শিল্পের টেকসই প্রসারে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।

কাঁকড়ার প্রজনন মৌসুম : গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা যায়, শীলা কাঁকড়া শীতকাল ব্যতিত সারাবছর প্রজনন করে থাকে। তবে, শীর্ষ প্রজনন মৌসুম ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস থেকে শুরু হয়ে জুন মাস পর্যন্ত। জুলাই-আগস্টে কিছুটা কমে আবার সেপ্টেম্বর মাসে বৃদ্ধি পায়। রেখাচিত্র ৩ এ ডিম ধারণকারি/বেরিড কাঁকড়ার প্রাপ্যতার ভিত্তিতে শীলা কাঁকড়ার প্রজনন মৌসুম দেখানো হলো।

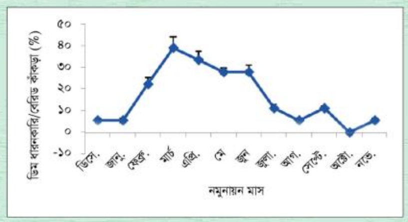

রেখাচিত্র ৩. বিভিন্ন মাসে ডিমধারণকারি / বেরিড কাঁকড়ার প্রাপ্যতার হার ও প্রজনন মৌসুম।

প্রজননক্ষম (বেরিড) মা কাঁকড়ার উৎপাদন

কাঁকড়া সাগরে প্রজনন করে বিধায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ডিমধারণকারি (বেরিড) মা কাঁকড়া উৎপাদন করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের লোনাপানি কেন্দ্রে গবেষণার মাধ্যমে সাগরের উপযুক্ত প্রজনন পরিবেশ সৃষ্টি করে হ্যাচারি পর্যায়ে ডিমধারণকারি মা কাঁকড়া উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে ৩০ পিপিটি লবণ পানি ব্যবহার করে সর্বোচ্চ (৬৯%) বেরিড কাঁকড়া উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে যার ডিম নিষেকের হার পাওয়া গেছে ৮৯%। হ্যাচারি পর্যায়ে ডিমধারণকারি কাঁকড়া উৎপাদন সাফল্য শীলা কাঁকড়ার প্রজনন ও টেকসই পোনা উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করবে। ডিমধারণকারি মা কাঁকড়া উৎপাদনের সার্বিক তথ্য নীচের সারণিতে প্রদান করা হলো :

সারণি ১. ডিমধারণকারি/বেরিড কাঁকড়া উৎপাদন

বিবরণ	পানির লবণাক্ততা		
	২৫ পিপিটি	৩০ পিপিটি	৩৫ পিপিটি
গড় ওজন (গ্রাম)	২৩৪±৪.৩০	২৬৭±৩.৮৯	২৭০±৩.৮৭
খোলসের প্রস্তা (সেমি.)	১১.০±০.৩৫	১০.৮±০.৪৯	১১.২±০.৫১
পালনকৃত মোট মা কাঁকড়া	১৬	১৬	১৬
ডিম ধারণ করেছে (সংখ্যা)	৩	১১	০
ডিম দেওয়ার সাফল্য (%)	১৯	৬৯	-
ডিম প্রস্ফুটনে সময় (দিন)	১২	১২	-
ডিম নিষেকের হার (%)	৮৬	৮৯	-

কাঁকড়ার লার্ভি প্রতিপালন ও পোনা উৎপাদন

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ২০১৫ সালে প্রথম এর সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এবং পরবর্তিতে লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনায় শীলা কাঁকড়ার প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করে। প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রাব ইনস্টার (সি-১) পর্যায়ে বেঁচে থাকার হার মাত্র ০.০১% ছিল। পর্যায়ক্রমিক গবেষণার মাধ্যমে সবুজ পানি (গ্রীণ ওয়াটার) ব্যবহার করে এবং তিন ধাপে (জইয়া-১ থেকে জইয়া-২; জইয়া-৩ থেকে মেগালোপা এবং মেগালোপা থেকে ক্রাব ইনস্টার বা সি-১) লার্ভি প্রতিপালনের মাধ্যমে পোনার বেঁচে থাকার হার ১.০৫% এ উন্নীত হয়েছে। তবে পোনার বেঁচে থাকার হার ৫-৮% এ উন্নীত করা না গেলে বাণিজ্যিকভাবে পোনা উৎপাদন লাভজনক হবে না। তাই পোনার মৃত্যুহার কমিয়ে টেকসই পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন।

সারণি ২. খাদ্য প্রয়োগ হার ও পদ্ধতি এবং পোনার বেঁচে থাকার হার

লার্ভি দশা	জইয়া-১	জইয়া-২	জইয়া-৩	জইয়া-৪	জইয়া-৫	মেগালোপা	মেগালোপা-ক্রাব ইনষ্টার
খাদ্যের প্রকার	রটিফার	রটিফার	রটিফার+আর্টেমিয়া নপলি	আর্টেমিয়া নপলি	২-৩ দিন বয়সী আর্টেমিয়া	৩-৫ দিন বয়সী আর্টেমিয়া	৩-৫ দিন বয়সী আর্টেমিয়া
খাদ্যের ঘনত্ব (প্রতি মিলি)	২০-২৫ টি	৩০-৪০টি	৩০-৪০ +০.২৫ টি	০.৫-১.০ টি	১.০-১.৫টি	১.৫-২.০টি	১.৫-২.০ টি + মাছের পেস্ট
বাঁচার হার (%)	৮৫	৭২	৫৭	৪০	১৭	৭.৭৫	১.০৫

কাঁকড়ার চাষ পদ্ধতি

কাঁকড়ার চাষ পদ্ধতিকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা যায় যথা, মোটাতাজাকরণ (ফ্যাটেনিং), ছোট/কিশোর কাঁকড়া প্রতিপালন করে প্রাপ্ত বয়স্ক কাঁকড়ায় রূপান্তর এবং নরম খোলসের কাঁকড়া উৎপাদন।

কাঁকড়ার মোটাতাজাকরণ পদ্ধতি : সাধারণত যে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী কাঁকড়ার দেহাভ্যন্তরে ডিম্বাশয় (স্থানীয় ভাষায় ঘিলু) অনুপস্থিত এবং প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ কাঁকড়ায় মাংশের পরিমাণ কম থাকে সেগুলো বিদেশে রপ্তানি হয় না। এই কাঁকড়াগুলোকে স্থানীয় ভাষায় খোশা কাঁকড়া বলে। এগুলোকে ১০-২০ দিন খাদ্য প্রয়োগ করে প্রতিপালন করলে স্ত্রী কাঁকড়ার দেহাভ্যন্তর ডিম্বাশয়ে পরিপূর্ণ হয় এবং পুরুষ কাঁকড়ার মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে রপ্তানিযোগ্য হয়। এই পদ্ধতিই মোটাতাজাকরণ বা ফ্যাটেনিং নামে পরিচিত। দেশের প্রান্তিক কাঁকড়া চাষীদের সিংহভাগ এ কাজের সাথে জড়িত।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বাঁশের ঝুড়িতে পালনের মাধ্যমে শীলা কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ শুরু। তৎপরবর্তী সময়ে, জোয়ার-ভাটা সংশ্লিষ্ট ঘের বা পুকুরের চারিপাশে বাঁশের বানা/পাটা বা নাইলন নেট দিয়ে ঘেরাও দিয়ে কাঁকড়া মোটাতাজাকরন বিস্তার লাভ করে। ইনস্টিটিউট নব্বই এর দশক হতে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের ওপর গবেষণা করে এ সংক্রান্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। মোটাতাজাকরণ পদ্ধতিতে বছরে ১২টি ব্যাচ মোটাতাজাকরণ করা হয়ে থাকে এবং প্রতি হেক্টরে গড় ২-৩ টন উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। এর পাশাপাশি একই পুকুরের তলদেশের মাটিতে এবং

ভাসমান বাঁশের বা প্লাস্টিকের খাঁচায় যুগপৎ কাঁকড়া ফ্যাটেনিং করে প্রতি একক এলাকায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তির মাধ্যমে পুকুরের ৪০% এলাকায় ভাসমান খাঁচা স্থাপন করে প্রতি বর্গমিটার খাঁচায় ২.৮২ কেজি হারে বছরে প্রতি হেক্টরে ১০,০০০ কেজি অতিরিক্ত কাঁকড়া উৎপাদন সম্ভব। তবে, প্রখর রৌদ্রোজ্বল দিনে এবং অতি বৃষ্টির সময়ে কাঁকড়ার অধিক মৃত্যুহার পরিলক্ষিত হয়েছে। যুগপৎ কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের সাথে শস্য বহুমুখিকরণে (*crop diversification*) প্রতি হেক্টরে ২-৩ টি গিফ্ট জাতের তেলাপিয়া মজুদ করে কাঁকড়ার পাশাপাশি প্রতি হেক্টরে মাছের উৎপাদন ২,০০০ কেজি পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

কিশোর কাঁকড়া প্রতিপালন : দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ১৪০,০০০ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। অতি সম্প্রতি অধিকাংশ সনাতন চিংড়ি ঘেরে চিংড়ির পাশাপাশি কম ঘনত্বে (৩,০০০-৫,০০০/হেক্টর) কিশোর কাঁকড়া (স্থানীয় ভাষায় কয়েন সাইজ/বোতাম সাইজ) মজুদ করে প্রাপ্ত বয়ষ্ক কাঁকড়া উৎপাদনের

প্রবণতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এতে করে চিংড়ির সাথে সাথী ফসল হিসেবে কাঁকড়া উৎপাদন করে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। তবে, নির্বিচারে কিশোর কাঁকড়া আহরণের ফলে প্রাকৃতিক মজুদ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে।

নরম খোলসের কাঁকড়া উৎপাদন : শীলা কাঁকড়া খোলস পরিবর্তনের মাধ্যমে বড় হয় এবং প্রতিবার খোলস পরিবর্তনে দৈহিক ওজন দেড় হতে দুইগুণ বৃদ্ধি পায়। খোলস পরিবর্তনের পর ৪-৬ ঘন্টা দেহাবরণ নরম থাকে। এই নরম অবস্থায় কাঁকড়া সংগ্রহ করে হিমায়িত করে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। আর এটিই হলো নরম খোলসের কাঁকড়া। কাঁকড়া স্বজাতিভোজী বিধায় নরম খোলসের কাঁকড়া উৎপাদনে সাধারনতঃ প্রতিটি প্লাস্টিকের ভাসমান বাক্সে ১টি কাঁকড়া মজুদ করা হয়ে থাকে। নরম খোলশের কাঁকড়ার উৎপাদন বছরে প্রতি হেক্টরে গড়ে ২০ মে. টন। শক্ত খোলসের কাঁকড়ার চেয়ে সহজ পরিবেশনযোগ্য বলে আন্তর্জাতিক বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে দেশে প্রায় ৫০ টি নরম খোলশের কাঁকড়া খামার গড়ে উঠেছে। এ খামারগুলোর বাক্সের সংখ্যা ৩৫ লক্ষেরও অধিক। এটি দৈনন্দিন চলমান প্রক্রিয়া, শীতকাল ব্যতিত অন্যান্য সময় (কমপক্ষে ৫ মাস) এটি চলে। গড়ে ৫% হারে খোলস পরিবর্তন হিসেবে প্রতিদিন ছোট কাঁকড়ার প্রয়োজন ১৭৫,০০০ টি, যা বছরে দাঁড়ায় (২৬২.৫+৩৫) লক্ষ = ২৯৭.৫ লক্ষ টি। যার পুরোটাই প্রকৃতি নির্ভর। মূল্যবৃদ্ধি ও ছোট কাঁকড়ার অভাবে অধিকাংশ খামার সব বাক্স একযোগে ব্যবহার করতে পারে না এবং অনেক খামার বন্ধের পথে। কাঁকড়া আহরণ ও চাষ উপকূলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়নের অন্যতম অবলম্বন এবং কাঁকড়া রপ্তানি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। কিন্তু অদ্যাবধি এ কর্মকান্ডে ব্যবহৃত সকল কাঁকড়া প্রাকৃতিক উৎস নির্ভর। একদিকে মোটাতাজাকরনে নির্বিচারে প্রজননক্ষম মা কাঁকড়া আহরণ চলছে। অপরদিকে, কিশোর কাঁকড়া চাষে এবং নরম খোলসের কাঁকড়া উৎপাদনে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছোট কাঁকড়া আহরণ হচ্ছে যত্রতত্রভাবে। যার ফলে প্রাকৃতিক মজুদ

নিয়মিত নবায়নের জন্য প্রজননের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ছে। এই অবস্থা হতে উত্তরণ এবং কাঁকড়া শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রজননক্ষম এবং কিশোর কাঁকড়া আহরণ না করা সংক্রান্ত যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন না হওয়া অবধি নরম খোলসের কাঁকড়া উৎপাদন খামার সীমিত রাখা একান্ত জরুরি। হ্যাচারি পরিচালনার জন্য দক্ষতা সম্পন্ন জনবল বৃদ্ধি সময়ের চাহিদা। প্রয়োজনে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা অবমুক্ত করে প্রাকৃতিক মজুদ উন্নয়ন আবশ্যক। উপরন্তু, কাঁকড়া চাষের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন অণুজীব ঘটিত রোগ-বালাইয়ের অশঙ্কা রয়েছে। তাই শীলা কাঁকড়ার অণুজীবঘটিত রোগ সনাক্তকরণ ও নিরাময়ের আগাম প্রস্তুতির ওপর জোর দিতে হবে। আর এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন দেশের কাঁকড়া সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও বিস্তৃতির দ্বার উন্মোচন করবে বলে আশা করা যায়।

লবস্টার : সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণে নতুন সম্ভাবনা

সীফুড বা সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদে সুপরিচিত নাম লবস্টার। ভোজনবিলাসীদের কাছে লবস্টার প্রিয় ও সুস্বাদু খাবার। এরা সমুদ্রের পাথুরে- প্রবালপ্রাচীর অঞ্চলে বসবাস ও বংশ বিস্তার করে। সামুদ্রিক এই মাছটির সাথে চিংড়ির যথেষ্ট মিল রয়েছে। বাংলাদেশে লবস্টার এর পরিচিতি খুব একটা নেই। তবে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে চিংড়ি ধরার ট্রলারে প্রায়ই লবস্টার পাওয়া যায় এবং তা বিদেশে রপ্তানি হয়। অধিক প্রোটিন সমৃদ্ধ, সুস্বাদু ও অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ এই মাছটির আহরণ ও চাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

লবস্টার পরিচিতি

লবস্টার শক্ত খোলসযুক্ত আর্থ্রোপোডা পর্বের সামুদ্রিক প্রাণি। এর দেহ দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম এবং আত্মরক্ষার জন্য ছোট ছোট শক্ত কাটা দ্বারা সজ্জিত থাকে। লবস্টার লেজের পিছন প্রান্ত ছড়িয়ে পুচ্ছ পাখনার সৃষ্টি করে। চোঁখ বৃন্তযুক্ত এবং পাঁচ জোড়া চলন উপাঙ্গ রয়েছে। বেশীর ভাগ লবস্টার গাঢ় সবুজ কিংবা গাঢ় নিলাভ বর্ণের অথবা বাদামী হয়ে থাকে এবং হেমোসায়ানিন উপস্থিতির কারণে এদের রক্তের রং নীল। বিশ্বে নানান প্রজাতির লবস্টার থাকলেও বেশীর ভাগ লবস্টার সর্বভূক শ্রেণীর ও নিশাচর। সাধারণত মাছ, মলাস্ক, ক্রাস্টাসিয়ান এমনকি ময়লা- আর্বজনাও এরা খায়, তবে আবদ্ধ স্থানে এরা স্বজাতীভূক। এদের বয়স নির্ধারণ করা কঠিন, তবে ১০০ বছর বয়সী লবস্টারও পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যানুযায়ী বিশ্বে সবচেয়ে বড় লবস্টারের ওজন ২৩.৩৬ কেজি। বিশ্বে খাদ্য হিসেবে লবস্টারের লেজ বেশ জনপ্রিয় যা 'লবস্টার টেইল' নামে পরিচিত।

চিত্র ১. ট্রপিক্যাল রক লবস্টার *Panulirus ornatus*

লবস্টারের প্রাপ্যতা ও বিচরণ ক্ষেত্র

পৃথিবীব্যাপি লবস্টার এর বৈচিত্র্যতা বিদ্যমান এবং এদের বিচরণ এলাকা বিস্তৃত। সাধারণত ৫ থেকে ৪০ মিটার গভীরতায় এবং ২৫ পিপিটির বেশী লবণাক্ততায় লবস্টার পাওয়া যায়। এরা সাধারণত ভারত, আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে বিচরণ করে থাকে। এছাড়াও দক্ষিণ লোহিত সাগর, আফ্রিকার পূর্ব উপকুল, আরব সাগর, ভারতের অন্ধ্র উপকূল ও উরিষ্যার উপকূলীয় জলাশয়, জাপান সমুদ্র, দক্ষিণ চীন সাগর, গালফ অফ থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, সলোমন দীপাঞ্চল, নিউকেলিডোনিয়া, গালফ অফ পাপুয়া, ফিজি ও অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে এরা বিচরণ করে থাকে। বাংলাদেশে সাধারণত Palinuridae পরিবারভূক্ত Spiny lobster বেশী পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কক্সবাজারস্থ সেন্টমার্টিন ও টেকনাফের তীরবর্তী অঞ্চলে লবস্টার পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরে লবস্টারের সঠিক বিচরণ ক্ষেত্র ও প্রজাতি নির্ণয় করা জরুরী। পৃথিবীতে সাধারণত তিন ধরণের লবস্টার পাওয়া যায়।

Spiny lobster	এরা সাধারণত *Palinuridae* পরিবারভুক্ত যা রক লবস্টার নামেও পরিচিত। এদের অনেক প্রজাতি অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক প্রযুক্তি কেন্দ্রে 'সামুদ্রিক মৎস্য জরীপ' এ পাওয়া তত্ত্বানুযায়ী বঙ্গোপসাগরে শনাক্ত করা ৬ ধরণের লবস্টারের ৪টি প্রজাতি Spiny lobster ভুক্ত। এগুলো হলো- *Panulirus polyphagus, P. versicolor, P. homarus* এবং *P. ornatus.*	*P. versicolor*
Clawed lobster	জনপ্রিয় Clawed lobster, Homaridae পরিবারভুক্ত যা True lobster, আমেরিকান লবস্টার ও কানাডিয়ান লবস্টার নামেও পরিচিত। Clawed lobster এর ৩০টি প্রজাতির মধ্যে ২টি প্রজাতি অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। যথা- American lobster *(Homarus americanus)* ও *H. gammarus*। এই দুই প্রজাতি সাধারণত আটলান্টিক মহাসাগরে পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৪০% অবদান রাখে।	*H. americanus*
Slipper lobster	Scyllaridae পরিবারভুক্ত প্রাণি যার প্রায় ৯০টি প্রজাতি পৃথিবীতে রয়েছে। এদের Claw না থাকায় True lobster বলা হয় না, তবে Spiny lobster লবস্টারের সাথে এদের যথেষ্ট মিল রয়েছে। আমাদের দেশে বঙ্গোপসাগরে এর ২টি প্রজাতি পাওয়া যায় এগুলো হলো- *Thenus orientalis* যা Sand lobster নামে পরিচিত এবং অন্যটি হলো- *Scyllarus depressus.*	*S. depressus*

লবস্টার চাষ ও ব্যবস্থাপনা

চিংড়ি চাষের চেয়ে লবস্টার চাষ জটিল প্রকৃতির কারণ এর জীবন চক্রের প্রতিটি ধাপ দীর্ঘ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হ্যাচারিতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে লবস্টার চাষ হচ্ছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ যেমন : ভারত, চীন, ভিয়েতনাম ও জাপানে লবস্টার চাষের প্রসার ঘটেছে। এসব দেশে Spiny lobster এর তিনটি প্রজাতি যথাক্রমে *Panulirus polyphagus, P. homarus* এবং *P. ornatus* চাষ করা হয়। খামারীরা সাধারণত ৭-১৫ মিমি. এর 'ওয়াইল্ড সীড' সংগ্রহ করে উপকূলীয় এলাকায় কাঠের তৈরি খাঁচায় নার্সিং করে। অতঃপর লোহার তৈরি খাঁচায় ১-২ বছর চাষ করে। নার্সিং সময়কালীন ফরমুলেটেড ফিড ও কপিপড খাওয়ানো হয় এবং গ্রো-আউট পর্যায়ে ট্রাশফিশ, শামুক-ঝিনুক ও সী-উইড খাবার হিসেবে দেওয়া হয়। চাষের সময় তাপমাত্রা (২৫-৩০ ডিগ্রী সে.), লবণাক্ততা (৩০-৪০ পিপিটি) এবং পানি প্রবাহ (২-৪ সেমি.) সতর্কতার সাথে দেখা হয়। *P. ornatus* লবস্টার ২০-২৪ মাসে প্রায় ৬০০-১০০০ গ্রাম এবং অপর দুই প্রজাতি ১০-১২ মাসে ২০০-৩০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে চিংড়ি চাষীরা এখনও সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করে থাকে, সেখানে লবস্টারের মতো জটিল চাষ ব্যবস্থাপনা তাদের জন্য অনেকটাই অনুপযোগী। তাই বঙ্গোপসাগরের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র ক্ষতিগ্রস্ত না করে লবস্টার ধরতে আহরণের সঠিক সময়, ফাঁদ/জাল ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে। তবে আবদ্ধ স্থানে লবস্টার চাষ কৌশলের সহজ প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্ভব হলে নিজেদের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।

চিত্র ২. ভিয়েতনামে লবস্টার চাষ

লবস্টার আহরণ ও উৎপাদন

লবস্টারের বর্তমান উৎপাদন বিগত দশকের চেয়ে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের মোট উৎপাদনের অর্ধেক আসে শুধুমাত্র আমেরিকা ও কানাডা থেকে। ১৯৮০ সালে লবস্টারের মোট উৎপাদন ছিল ১১০,৮৯৪ টন যা কয়েক দশকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে হয়েছে ২৩১,৯৬৮ টন।

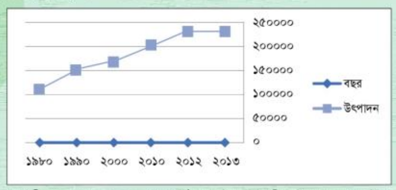

রেখাচিত্র ১. ১৯৮০-২০১৩ সাল পর্যন্ত লবস্টারের বৈশ্বিক উৎপাদন (মে.টন)

সামুদ্রিক অর্থনীতিতে লবস্টার

আন্তর্জাতিক বাজারে লবস্টার গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য পণ্য। বর্তমানে গড়ে প্রতি কেজি লবস্টার বিক্রি হয় ১,৬০০টাকা যা চিংড়ি বা অন্যান্য মাছের চেয়ে তুলনামুলকভাবে বেশী। পৃথিবীর অনেক লোক এখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লবস্টার চাষ, আহরণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত। লবস্টার রপ্তানি করে অনেক দেশ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি, জাপান ও ভিয়েতনাম তাদের দেশীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে। বাণিজ্যিকভাবে প্রধানত চার ধরণের লবস্টার গুরুত্বপূর্ণ যথা: আমেরিকান লবস্টার, ইউরোপিয়ান লবস্টার, রক লবস্টার এবং ট্রপিক্যাল লবস্টার। বাংলাদেশ এখনও লবস্টার চাষ হয় না বা চাষের প্রচেষ্টাও এখনো হয়নি। তবে ট্রপিক্যাল লবস্টারের কয়েকটি প্রজাতি বঙ্গোপসাগরে পাওয়া যায় যা বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। টেকনাফ ও সেন্টমার্টিনের আশেপাশের এলাকাগুলোতে বিভিন্ন ট্রলার ও চিংড়ি ধরার জালে পাওয়া লবস্টার পর্যটকের চাহিদা পূরণ করে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও ঢাকার বিভিন্ন হোটেলে সরবরাহ করা হয়। হোটেলে-রেস্তোরাঁয় প্রতিটি লবস্টার বিক্রি হয় ১,০০০-৪,০০০ টাকায়। দেশে লবস্টার প্রক্রিয়াজাতকরণের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তা পার্শ্ববর্তি দেশে পাচার হচ্ছে।

লবস্টারের পুষ্টিমান

সামুদ্রিক অনেক মাছের চেয়ে পুষ্টিমানের বিচারে লবস্টারে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড যা আমাদের শরীরের জন্য বেশি প্রয়োজন। এছাড়াও এর প্রোটিন মান চিংড়ির প্রায় কাছাকাছি এবং খনিজমান কাঁকড়া ও চিংড়ির তুলনায় অনেক বেশী। সুস্বাদু ও আমিষযুক্ত হওয়ায় বিশ্বের নামী-দামী অনেক রেস্টুরেন্টে লবস্টারের ব্যপক চাহিদা রয়েছে।

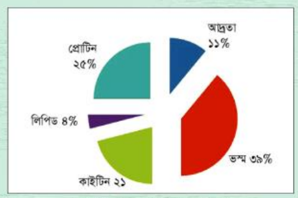

রেখাচিত্র ২. লবস্টারের পুষ্টিগুণ

বাংলাদেশে লবস্টার চাষের সম্ভবনা

বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার ও সাগরকণ্যা পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় রয়েছে লবস্টার চাষের অপার সম্ভাবনা। এই দুই উপকূলীয় অঞ্চলের আবহাওয়া, পানি, তাপমাত্রা ও খাবারের প্রাপ্যতা লবস্টার চাষে বিশেষ উপযোগী। লবস্টার চাষে আদর্শ তাপমাত্রা ২৫-৩০ ডিগ্রী সে. এবং লবণাক্ততা ৩০-৪০ পিপিটি যা আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও লবস্টার চাষে ব্যবহৃত খাবার যেমন ট্রাশ-ফিশ, শামুক-ঝিনুক ও সী-উইড এর প্রাপ্যতা রয়েছে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত Spiny lobster এর চারটি প্রজাতি যথাক্রমে *P. ornatus, P. homarus, P. polyphagus* এবং *P. versicolor* বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও চাষ উপযোগী। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে রয়েছে পর্যাপ্ত চিংড়ি হ্যাচারী, প্রাথমিকভাবে এসব হ্যাচারীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ান ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে লবস্টার চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়াও স্থানীয় উদ্যোক্তা ও বেসরকারী সংস্থাগুলো লবস্টার চাষে এগিয়ে আসতে পারে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক অঞ্চলে লবস্টারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর বিচরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও আহরণের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য গবেষণা জরুরী। এক্ষেত্রে লবস্টার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে পাশাপাশি দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্রতা দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে লবস্টার চাষে বেশ কিছু সমস্যা বিদ্যমান, যেমন :

- লবস্টারের লার্ভির অপর্যাপ্ততা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ (লবনাক্ততা, খাদ্য ও অপর্যাপ্ত তাপমাত্রা) জটিল প্রকৃতির
- সমুদ্র তীরবর্তী ও উপকূলীয় অঞ্চলে খাঁচায় লবস্টার চাষ ব্যবস্থাপনা ব্যয়সাপেক্ষ ও ঝুকিপূর্ণ
- দক্ষ হ্যাচারি টেকনিশিয়ান ও প্রশিক্ষকের অভাব

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে লবস্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাই এর পুষ্টিমান ও বাজার মূল্য বিবেচনায় গবেষণা অতীব জরুরী। নিম্নেলিখিত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করলে দেশীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি লবস্টার বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে।

- বাংলাদেশের সামুদ্রিক অঞ্চলে লবস্টারের প্রজাতি চিহ্নিতকরণ, মজুদ ও আহরণ মাত্রা নির্ণয়
- লবস্টারের জীবন চক্র নির্ণয়
- বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন লবস্টারের প্রজনন, পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা নির্ণয়
- খাঁচায় লবস্টারের চাষ সম্ভাবনা নিরূপন।

বাংলাদেশ সমুদ্র বিজয়ের ফলে বর্তমানে ১১৮,৮১৩ বর্গ কিমি. সমুদ্র অঞ্চল পেয়েছে। বিশাল এই সামুদ্রিক জলরাশির উপকূলীয় অঞ্চলে লবস্টার চাষে রয়েছে অপার সম্ভাবনা। প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বিশাল অংশে লবস্টার চাষের সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সরকারি-বেসরকারিভাবে উদ্যোগ নিলে এসব অঞ্চল খুব সহজেই লবস্টারের চাষের আওতায় আসবে। এতে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

উপকূলে সবুজ ঝিনুক (Green Mussel) চাষের সম্ভাবনা

বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল সমুদ্রসীমা ও ৩.২২ মিলিয়ন হেক্টর উপকূলীয় জলজ এলাকা যা মাৎস্যসম্পদের উৎপাদন আরো বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। উপকূলীয় এলাকা বাংলাদেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ দখল করা সত্ত্বেও প্রতিকূল পরিবেশ ও সদা পরিবর্তনশীল লবণাক্ততার কারণে চিংড়ি চাষ ব্যতীত অন্য কোন ফসল চাষ দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। উপকূলীয় এলাকায় বাগদা চিংড়ির চাষ যেমন বাংলাদেশের জন্য বয়ে এনেছে সাফল্য তেমনি অদূর ভবিষ্যতে যুগোপযোগী সাফল্য বয়ে আনবে সবুজ ঝিনুক (Green mussel) এর চাষ। সবুজ ঝিনুক Mollusca পর্বের Mytilidae গোত্রের ও Perna গণের এক প্রকারের ঝিনুক যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম *Perna viridis*। এদেরকে প্রধানত ভারত-মহাসাগরীয় অঞ্চলের ক্রান্তীয় ও উপকূলীয় এলাকায় পাওয়া যায়। সবুজ ঝিনুকের পরস্পরযুক্ত দুটি ডিম্বাকৃতির খোলস থাকে এবং খোলসে সবুজ ও মিশ্র বাদামী রঙের রেখা থাকে। এরা দৈর্ঘ্যে সাধারণত ১০০ থেকে ১৫০ মিমি. হয়ে থাকে। সবুজ ঝিনুক প্রধানত ছাঁকন পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক খাবার যেমন ফাইটোপ্ল্যাংক্টন বা জুয়োপ্ল্যাংক্টন এবং অন্যান্য জৈবকণা খেয়ে জীবন ধারণ করে। এরা বাইসাস থ্রেড (Byssus thread) এর মাধ্যমে কোন অবলম্বনের সাথে সংযুক্ত হয়ে জীবণধারণ করে থাকে। পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবক যেমন তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, প্রাকৃতিক খাবারের প্রাচুর্যতা ইত্যাদির প্রভাবে বছরের বিভিন্ন সময় যেমন বসন্তের শুরুর দিকে এবং শরতের শেষের দিকে এরা ডিম দিয়ে থাকে।

চিত্র ১. মহেশখালী চ্যানেল থেকে আহরিত সবুজ ঝিনুক

বাংলাদেশে যদিও সবুজ ঝিনুকের চাষ এখনো প্রচলিত হয়ে ওঠেনি কিন্তু এদের মাংস ও খোলসের বিশ্বব্যাপি চাহিদার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এদের চাষ খুব জনপ্রিয়। চীন, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভারত এ সুলভ প্রোটিনের উৎস হিসেবে সবুজ ঝিনুক এর চাষ খুবই প্রচলিত। এমনকি সিঙ্গাপুর এর মতো একটি উন্নত দেশের মাৎস্যসম্পদ উৎপাদনের প্রায় ৭০ শতাংশ জুড়েই রয়েছে সবুজ ঝিনুক। থাইল্যান্ড হলো বিশ্বে সবুজ ঝিনুক এর দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক। মালয়েশিয়াও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সবুজ ঝিনুক চাষ করে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সবুজ ঝিনুকের চাষ উপজাতি জনগোষ্ঠীর প্রোটিনের চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে।

সবুজ ঝিনুক চাষের সুবিধাসমূহ

- এদের বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয় এবং অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়।
- প্রাকৃতিক উৎস হতেই স্প্যাট (Spat) বা বীজ পাওয়া যায়।
- সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক খাবারের ওপর নির্ভরশীল তাই এদের চাষ করতে কোন প্রকার বাহ্যিক খাদ্য খরচের প্রয়োজন পড়ে না।
- এদের মাংস বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উপাদেয় খাদ্য তাই রপ্তানি চাহিদাও প্রচুর।

- এদের খোলস চুন উৎপাদন, মাছ ও পোলট্রির খাবারে ক্যালসিয়াম এর উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- সবুজ ঝিনুক খুব অল্প সময়েই বাজারজাত করা যায়।
- চাষ ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও প্রযুক্তিগত খরচ অন্যান্য জলজ প্রাণির চাষের তুলনায় তুলনামূলক কম হওয়াতে এদের চাষ জনপ্রিয়।

বাংলাদেশে সবুজ ঝিনুক চাষের সম্ভাবনা

- উপকূলীয় যেসব উন্মুক্ত লবণাক্ত জলাশয় এখন পর্যন্ত কোন প্রকার চাষের আওতায় আসেনি, সবুজ ঝিনুক চাষের মাধ্যমে সেসব এলাকার সঠিক ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে।
- উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।
- প্রায় ২০ লক্ষ উপজাতি জনগোষ্ঠীর নিয়মিত খাবার হিসেবে আমিষের চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখবে।
- ইউরোপীয় দেশসমূহে রপ্তানি চাহিদা অনেক বেশি হওয়ায় দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবে এবং নতুন একটি রপ্তানি বাজার তৈরি হবে।
- এদের খোলস মাছ ও পোল্ট্রি খাদ্যে ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে এবং চুন তৈরির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- উপকূলীয় এলাকাসমূহে সবুজ ঝিনুক প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য নতুন শিল্প ও সবুজ ঝিনুকের দেশীয় বাজার সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে।
- বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্রসীমা ও উপকূলীয় এলাকার নতুন একটি অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনে অবদান রাখবে।
- দেশের সামগ্রিক মাৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশে সবুজ ঝিনুক নিয়ে গবেষণা

বাংলাদেশে সবুজ ঝিনুকের চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন ও বিস্তারের লক্ষ্যে 'চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়' এর মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল' এর NATP-2 প্রকল্পের অর্থায়নে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রকল্পে চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলার রেজুখাল, মহেশখালী, কুতুবদিয়া চ্যানেলের প্রতিটিতে ৫টি গবেষণা স্থান ও টেকনাফ উপজেলার নাফ নদীতে সবুজ ঝিনুক চাষের সম্ভাব্যতা ও চাষ পদ্ধতি উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গবেষণা কাজের শুরুতে উল্লেখিত এলাকাসমূহে চাষের উপযুক্ততা যেমন : গভীরতা, স্রোত, তাপমাত্রা, প্রাকৃতিক খাদ্য ও উক্ত প্রজাতির প্রাকৃতিক প্রাচুর্যতা, লবণাক্ততা, অম্লত্ব, ক্ষারকত্ব, দ্রবীভুত অক্সিজেন উপস্থিতিসহ বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে গবেষণা স্থানসমূহ নির্বাচন করা হয়। অতঃপর প্রাকৃতিক উৎস হতে স্প্যাট বা বীজ সংযুক্ত হওয়ার জন্য চার প্রকারের অবলম্বন যথাক্রমে দড়ি, ফাঁসযুক্ত মোটা দড়ির জাল, বাঁশ, বাঁশ ও জালের তৈরি খাঁচা ইত্যাদি অবলম্বন হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে স্থাপন করা হয়। নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে ব্যবহৃত বিভিন্ন অবলম্বনে তুলনামূলকভাবে সবুজ ঝিনুকের স্প্যাট সংযুক্ত হওয়ার হার পর্যবেক্ষণ করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট সময় ব্যাপ্তি অনুসারে নমুনা সংগ্রহ করে গড় বৃদ্ধি হার, মৃত্যু হার, গোনাডের পরিপক্কতা, প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজনন হার ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়। পানির প্রায় ২ মিটার গভীরে তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার ক্রমপরিবর্তন কম হওয়ার কারণে সবুজ ঝিনুকের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে।

চিত্র ২. গবেষণাগারে সবুজ ঝিনুকের খাদ্যাভাস পর্যবেক্ষণ

তাছাড়া প্রাকৃতিক উৎস ও চাষকৃত উৎস থেকে সবুজ ঝিনুক এর পরিপক্ক নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে এদের পুষ্টিগত উপাদানের তুলনামূলক পরীক্ষা করা হয়। গবেষণায় এখন পর্যন্ত বিভিন্ন পদ্ধতিতে সবুজ ঝিনুকের চাষে খুবই আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া গেছে। উপকূলীয় এলাকায় সবুজ ঝিনুক চাষের বিস্তার ঘটাতে এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

চিত্র ৩. গবেষণাগারে সবুজ ঝিনুকের গোনাডের পরিপক্কতা পর্যবেক্ষণ

সবুজ ঝিনুকের চাষ উপযোগী স্থানের বৈশিষ্ট্য

- পানির গভীরতা সর্বনিম্ন ১ মিটার (ভাটার সময়) হতে হবে
- তাপমাত্রা ২৫.৩০ থেকে ৩৪.৬০ সেলসিয়াস থাকতে হবে
- স্রোতের গতি কম থাকা বাঞ্চনীয়
- স্প্যাট সংযুক্ত হওয়ার জন্য উপযুক্ত জায়গা বা অবলম্বন থাকা প্রয়োজন
- প্রাকৃতিক খাবারের প্রাচুর্যতা থাকতে হবে।

সবুজ ঝিনুকের চাষ পদ্ধতি

সবুজ ঝিনুক প্রধানত নিমজ্জিত বা ভাসমান ভেলায় (Raft), খাঁচায়, লং লাইন (Long line) বা সরাসরি তলদেশে চাষ করা যায়। তাছাড়া, বিভিন্ন রকম অবকাঠামো নির্মাণ করেও এদের চাষ করা যায়। তবে গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনাপূর্বক বিভিন্ন ধরণের ভাসমান অবকাঠামোই চাষের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়। সবুজ ঝিনুকের প্রজনন মৌসুম হলো জুন-জুলাই ও ডিসেম্বর-জানুয়ারি। প্রজনন মৌসুমের পূর্বেই চাষের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। একটি প্রচলিত ভাসমান পদ্ধতিতে সাধারণত নির্বাচিত চাষ উপযোগী এলাকায় বিভিন্ন মধ্যমাকারের প্লাস্টিকের ড্রাম বা ব্যারেল নির্দিষ্ট দূরত্বে কয়েক সারি শক্ত দড়ির সাথে বেঁধে দেয়া হয় যেগুলো সম্পূর্ণ কাঠামোকে ভাসিয়ে রাখার কাজ করে থাকে। এরপর ড্রামসহ সম্পূর্ণ অবকাঠামোটিকে দড়ির সাহায্যে দুইপাশ থেকে কয়েকটি খুঁটির গাঁথুনির সাথে বেঁধে দেয়া হয় যাতে অবকাঠামোটি জোয়ার-ভাটায় ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে এবং স্রোতে ভেসে যেতে না পারে। নির্মিত অবকাঠামোটিতে বিভিন্ন ধরণের অবলম্বন ব্যবহার করা হয় যাতে প্রাকৃতিকভাবে স্প্যাট সংযুক্ত হতে পারে। গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অবলম্বন হিসেবে বিভিন্ন ধরণের দড়ির ব্যবহারে কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া গেছে। দড়ির মধ্যে মূলত ১০ ফুট দৈর্ঘ্যের জাহাজে ব্যবহৃত মোটা পাটের ও নাইলনের দড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই দড়িগুলোকে মূল দড়িটির সাথে নির্দিষ্ট দূরত্বে এমনভাবে সংযুক্ত করা হয় যাতে তারা তলদেশের নুন্যতম এক ফুট উপরে থাকে। গবেষণা ফলাফলে দেখা গেছে যে, এই ধরণের দড়ি ব্যবহারের ফলে প্রতি ফুট দড়িতে ২৫০ থেকে ৩০০টি পর্যন্ত স্প্যাট সংযুক্ত হয়েছে। এভাবে সহজে এবং অল্প খরচে উপকূলীয় এলাকায় সবুজ ঝিনুক চাষের অবকাঠামো নির্মাণ করা যেতে পারে।

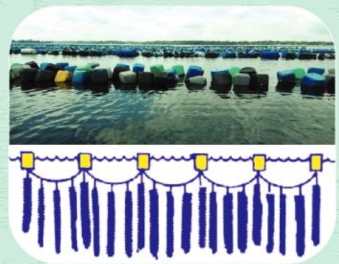

চিত্র ৪. সবুজ ঝিনুকের চাষ পদ্ধতি

প্রজনন মৌসুমের এক থেকে দুই মাস পরে প্রাকৃতিকভাবে স্প্যাটগুলো (২-৫ সপ্তাহ বয়স, ০.২৫-০.৩ মিমি. যে অবস্থায় বীজগুলো কোন কাঠামোতে সংযুক্ত হয়) নির্মিত অবকাঠামোতে সংযুক্ত হতে শুরু করে। নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে সংযুক্ত হওয়ার হার ও বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রায় ১২ থেকে ১৫ মাসের মধ্যে এরা বাজারজাতকরণের উপযোগী (৩৫-৪০ মিমি.) হয়ে ওঠে।

স্বল্প আয়তনের আমাদের এই দেশের রয়েছে বিশাল সমুদ্রসীমা ও উৎপাদনক্ষম উপকূলীয় এলাকা যার অধিকাংশ অংশেরই সঠিক ব্যবহার এখনো নিশ্চিত হয়নি। সবুজ ঝিনুক চাষ এমনই এক সম্ভাবনার নাম যা আমাদের ব্লু ইকোনোমি আরো সচল করে উপকূলীয় এলাকাসমূহকে গড়ে তুলতে পারে অর্থনীতির এক বিশাল চালিকাশক্তি হিসেবে। অবদান রাখতে পারে আমাদের মাৎস্যসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে।

কৃতজ্ঞতা : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক NATP-2 প্রকল্পের CRG এর আওতায় এই গবেষণা প্রকল্পকে অর্থায়ন করার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাছাড়া অন্তর সরকার ও আবরার শাকিলকে প্রবন্ধ লেখার কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সী-ফুড বা সামুদ্রিক খাদ্য হিসেবে স্কুইডের সম্ভাবনা

সাগরের যে সকল সেফালোপড খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় স্কুইড তাদের মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশে এটি একটি অপ্রচলিত সামুদ্রিক মৎস্য খাদ্য। সম্প্রতি আমরা সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে ১১৮,৮১৩ বর্গ কিমি. জলরাশির মালিকানা পেয়েছি তাই সামুদ্রিক মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য গ্রহণের প্রবণতা বাড়ানোর প্রতি জোর দেয়ার সময় এসেছে। পৃথিবীর বহু দেশে খাদ্য হিসেবে স্কুইড গ্রহণ করা হয়। উচ্চমান সম্পন্ন প্রোটিন এবং স্বল্প কোলেস্টেরলের জন্য এর গ্রহণ যোগ্যতা রয়েছে। ওমেগা-৩ এর উপস্থিতি থাকায় এটি স্বাস্থ্যকরও বটে। আমাদের দেশেও প্রেটিনের উৎস হিসেবে এর ব্যবহার ও গ্রহণযোগ্যতা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রাখতে পারে। নতুন খাদ্য হিসেবে সরাসরি কিংবা মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে স্কুইডের ব্যবহার বাড়ানো হলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে একটি নতুন মৎস্যজাত পণ্যের আবির্ভাব হবে যা বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচন করবে।

স্কুইডের পরিচিতি

স্কুইড টেউথিডা গোত্রীয় এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণি। স্কুইডের আকার বৈচিত্রময়। স্কুইড সাধারণত ১ সেমি. থেকে ১৪ মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। টেউথিডা গোত্রে প্রায় ৩০০ প্রজাতির স্কুইড রয়েছে। অন্যান্য সেফালোপডের মত স্কুইডের স্বতন্ত্র মস্তক, বাহু ও ছদ্মবেশি আচরণ রয়েছে এমনকি মেরুদন্ডী প্রাণিদের মত দেখতে চোখ ও বুদ্ধিদীপ্ত মস্তিষ্ক রয়েছে। একটি নরম খোলসের বাইরে থাকা হাতগুলোর মধ্যে আটটি ছোট ও দুটি বড়। লম্বা হাত বা টেনটাক্যাল দিয়ে তারা শিকার ধরে আর ছোট হাত দিয়ে শিকার মুখে দেয়। কপার সমৃদ্ধ হেমোসায়ামনিনের উপস্থিতির কারণে এদের রক্ত নীল হয়। স্ত্রী স্কুইড পুরুষ স্কুইডদের চেয়ে বড় ও শক্তিশালী হয়। স্কুইড সাধারণত ছোট আকারের স্কুইড, মাছ, চিংড়ি, আক্টোপাস প্রভুতি প্রাণি শিকার করে খায়। বিপদে পড়লে স্কুইড পানিতে এক ধরণের রঙ্গিন কালি ছুড়ে দেয়, ফলে শিকারিরা তাদের দেখতে পারে না এবং তখন তারা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে। মজার বিষয় হলো স্কুইড পরিবেশগত পরিবর্তনের সাথে অভিপ্রায়ণ করতে পারে। এদের উভয় পাশে সাতরানোর জন্য পাখা রয়েছে। তবে অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণির মতো স্কুইডের বেশিরভাগ প্রজাতি সমুদ্রে চলাফেরা ও গতিশীলতার জন্য এই পাখনার ওপর নির্ভরশীল নয়।

স্কুইড একটি নিশাচর প্রাণি। ত্বকে ক্রোমাটোফরের উপস্থিতির কারণে অন্ধকার সাগরে এরা আলো তৈরি করতে পারে। বেশির ভাগ স্কুইড একটি দলে তাদের প্রজননকার্য সম্পন্ন করে থাকে এবং ডিমের থলি সাগরের আগাছায়/তলায় রাখে। স্কুইডের জীবনকাল সাধারণত ১ বছর তবে কিছু কিছু প্রজাতি ৩-৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এদের বেশিরভাগই একবার প্রজননের পর মারা যায়। মৃত্যুর পর তাদের দেহ খাদ্য চক্রের সাথে পুনর্ব্যহারযোগ্য হয় যেটি পরবর্তীতে তাদের বাচ্চাদের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ১. *Loligo* spp.

স্কুইডের প্রাপ্যতা ও বিস্তৃতি

বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন: ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মরিশাস, আইসল্যান্ড, ফ্রান্স, বৃটেন, ডেনমার্ক, ইটালী, নরওয়ে প্রভৃতি দেশসহ আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর ও উত্তরপূর্ব এলাকা, ভূমধ্যসাগর এবং বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরে স্কুইডের প্রাপ্যতা রয়েছে। স্কুইডের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে কিছু কিছু প্রজাতি সমুদ্রের অনেক গভীরে আর কয়েকটি থাকে সমুদ্রপৃষ্ঠের ঠিক নিচে। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর ও দক্ষিণে Ommastrephidae পরিবারের বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ৫টি প্রজাতি *Illex argentinus, Todarodes pacificus, Nototodarus sloanii, Illex*

illecebrosus, Dosidicus gigas মৎস্য শিকারিদের দ্বারা ব্যাপকভাবে ধৃত হয়। বাংলাদেশে টেউথিডা বর্গীয় *A. sparcki, D. singhalensis, L. edulis* নামে তিনটি প্রজাতি সনাক্ত করা হয়েছে যা আঞ্চলিকভাবে গুটি নুইল্যা, রোল নুইল্যা ও নল নুইল্যা নামে পরিচিত। এছাড়াও মহেশখালী ও সোনাদিয়া দ্বীপে *Loliginidae* পরিবারের প্রজাতি *Photololigo duvaucelii* এর উপস্থিতি দেখা গেছে যেটি ৩০-১৭০ মিটার গভীরতায় বিচরণ করে থাকে। সম্প্রতি ভারতে এই প্রজাতিটি চাষ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যিকভাবে আহরণের জন্য এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি প্রজাতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আধুনিক স্কুইড ফিশারি শুরু হয়। তখন থেকেই সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণের অন্যতম একটি অংশ হিসেবে স্কুইড স্থান দখল করে আছে। পৃথিবীতে স্কুইড ধরার প্রধানত ১৫টি স্থান রয়েছে। জিগিং পদ্ধতিতে আকর্ষণীয় টোপ ব্যবহার করে স্কুইড ধরা হয় তবে বেড় জাল দিয়েও স্কুইড ধরা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ সেফালোপড ধরা হয় তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলে স্কুইড। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) অনুসারে ২০০২ সালে সর্বমোট সেফালোপড ধরা হয়ে ছিল প্রায় ৩২ লক্ষ টন। এর মধ্যে ২১.৮ লক্ষ টন ছিল স্কুইড যা মোট আহরণের ৭৫.৮%। সবচেয়ে বেশি আহরণকৃত স্কুইডের মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টাইন শর্টফিন স্কুইড (*Illex argentinus*)- ২৩.৩%, জাপানিজ ফ্লাইং স্কুইড (*Todarodes pacificus*)- ২৩%, জাম্বো স্কুইড (*Dosidicus gigas*) - ১৮.৬%। এছাড়াও সাধারণ স্কুইড যেটি *Loliginidae* পরিবারের অর্ন্তভূক্ত, ধরা পড়েছিল ১০.৩%। স্কুইডের কিছু প্রজাতি বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য সারা বিশ্বব্যাপী পরিচিত। নিম্নে এমনি কিছু জনপ্রিয় স্কুইডের বর্ণনা দেয়া হলো :

ইউরোপিয়ান স্কুইড / *Loligo spp.*	ইউরোপিয়ান স্কুইডটি মৎস্যজীবিদের প্রধান শিকার। এটি সাগরের উপরিভাগে থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে ধরা পারার পরও অতি উর্বর প্রজাতি হওয়ায় বিলুপ্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এটি দৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ ৬৪০টি মিমি. এবং ওজন ১.৩২-২.৩ কেজি হয়ে থাকে।	
জায়ান্ট স্কুইড / *Architeuthis dux*	স্কুইডের মধ্যে কলোসাল স্কুইডের পরে সবচেয়ে বড় জায়ান্ট স্কুইড যা গভীর সমুদ্রের শুঁড়ওয়ালা শামুক নামে পরিচিত। এটি লম্বায় ৩৩-৪৩ ফুট পর্যন্ত হয় যারা মানুষকেও হত্যা করতে সক্ষম। এটি ৩০০-১০০০ মিটার গভীরতায় বসবাস করে। তিমি এদের প্রধান শিকার। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক মা স্কুইড ৫ কেজি ডিম দিয়ে থাকে।	
জাম্বো স্কুইড / *Hamboldt squid / Dosidicus gigas*	স্কুইডের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী হল জাম্বো স্কুইড। দলের অন্য সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে এরা হাঙ্গরকেও আক্রমণ করে। এটি ঘন্টায় ২৪ কিমি. বেগে চলাচল করতে পারে।	

কলোসাল স্কুইড / *Anterctic squid / Mesony choteuthis hamiltoni*	পৃথিবীর অন্য যে কোন প্রাণির চোখের চেয়ে কলোসাল স্কুইডের চোখ সবচেয়ে বড় (প্রায় ২৮ সেমি.), যা একই সঙ্গে টেলিস্কোপ ও মানুষের চোখ দুটোর মতই কাজ করে। এটি ৩৯-৪৬ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং ওজনে ১৬০০ পাউন্ডের বেশি হয়। গায়ের রঙ লাল হওয়ায় স্থানীয়রা একে সমুদ্রের লাল শয়তান বলে। এটি অমেরুদন্ডী প্রাণিদের মধ্যে সবচেয়ে বড়।	
গ্লাস স্কুইড / *Cranchia spp.*	এরা কাচের মত স্বচ্ছ এবং আকার বেলুনের মত। এদের তিন জোড়া পা এবং লম্বায় ১০ সেমি. থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এরা জীবনের প্রথম অবস্থায় সাগরের উপরিভাগে থাকে এবং পরবর্তীতে গভীর সমুদ্রে চলে যায়।	
ভ্যাম্পায়ার স্কুইড / *Vampyroteuthis internalis*	এদের লম্বা কালো বাহুটি ভ্যাম্পায়ারদের পরিধানকৃত কালো টুপির মত দেখায়। একারণে এদের ভ্যাম্পায়ার স্কুইড বলা হয়। স্কুইডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দীর্ঘায়ু ভ্যাম্পায়ার স্কুইডের। এরা সমুদ্রের ৬০০-৯০০ মিটার গভীরে অত্যন্ত কম অক্সিজেন মাত্রায় (৩%) বসবাস করে।	
জাপানিজ ফাইং স্কুইড/ *Todarodes pacificus*	এরা ৩০ মিটার পর্যন্ত দূরত্বে উড়তে পারে। এদের মাথার চার পাশে রিং এর ন্যায় শুঁড় থাকে যা দিয়ে এদের বয়স গণনা করা হয়। জাপানে জনপ্রিয় খাদ্য সুসি তৈরীতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়।	

খাদ্য হিসেবে স্কুইড ও স্কুইডের পুষ্টিমান

স্কুইডের পুষ্টিমান বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রতি ১০০ গ্রাম স্কুইডে শক্তির পরিমাণ ১৭৪ কিলো ক্যালরি, চর্বি কম (২%), প্রোটিন বেশী (১৯%) এবং খেতেও সুস্বাদু। তাই পৃথিবীব্যাপি এটি একটি জনপ্রিয় খাদ্য। যদিও খাদ্য হিসেবে স্কুইড আমাদের দেশে খুব বেশি প্রচলিত নয়, তবে মাছের বহুবিধ ব্যবহারের কথা চিন্তা করে আমাদের খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বর্তমানে সামুদ্রিক মাছের পাশাপাশি স্কুইড বিভিন্ন রেস্তোরাতে মুখরোচক খাবার হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন: গ্রীক, চীনা, জাপানি, ইতালীয়, শ্রীলংকান, থাই, ভিয়েতনামী, কোরীয়, স্পেনীয়, পর্তুগীজ ও ফিলিপিনো রান্নায় স্কুইড খুবই জনপ্রিয়। ইংরেজিভাষী দেশগুলোতে খাদ্য হিসেবে স্কুইড ইতালীয় শব্দ ক্যালামারি নামে পরিচিত। তবে বিভিন্ন দেশ স্কুইড ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব রেসিপি তৈরি করে থাকে। স্কুইডের শরীরের অভ্যন্তরে মশলার পুর দিয়ে, অত:পর লম্বা বা গোলাকৃতি টকুরা করে ভেজে অনেক সুস্বাদু রেসিপি তৈরি করা হয়। স্যুপ তৈরিতেও স্কুইড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্কুইডের শুধুমাত্র ঠোঁট ও গ্লাডিয়াস বাদ দিয়ে পুরো অংশই খাবার উপযোগী। জাপানীজরা বছরে প্রায় ৭ লক্ষ টন স্কুইড খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে স্কুইডের বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব যা পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি খাবারে নতুন মাত্রা আনবে। ইতোমধ্যে দেশের কিছু রেস্তোরাতে স্কুইডের তৈরি বিভিন্ন খাবার পাওয়া যাচ্ছে। স্কুইডে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ ৪৯.২%। এছাড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও মিনারেলস তাই বাচ্চাদের জন্য এটি একটি উচ্চমান সম্পন্ন খাবারের উৎস হতে পারে।

চিত্র ২. স্কুইডের তৈরি মজাদার খাবার (ফ্রাইড স্কুইড ও স্কুইড নুডুলস)

ক্যালামারি ফ্রাই (Calamari fry) : বাজারে প্রাপ্ত স্কুইড থেকে খাবার উপযোগি অংশ ড্রেসিং করে নিতে হবে। পরিস্কার অংশগুলোকে ছোট ছোট রিং করে কেটে নিয়ে লবণ ও লেবুর রস দিয়ে মাখিয়ে রাখতে হবে। ২৫ মিনিট পরে আবার ধুয়ে পানি ঝড়াতে হবে। স্কুইডগুলিকে চালের গুড়া, ময়দা, গোল মরিচের গুড়া, বিট লবণ ও কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মাখিয়ে ১০ মিনিট মেরিনেট করতে হবে। পরে গরম তেলে ভেজে গরম গরম সস বা মেয়োনেজ দিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

- স্কুইড - ১/২ কেজি
- লবণ - ১ চা চামচ
- লেবুর রস - ২ চা চামচ
- চালের গুড়া - ২ চা চামচ
- ময়দা - ৪ চা চামচ
- গোল মরিচ গুড়া - ১/২ চা চামচ
- বিট লবণ - ১/২ চা চামচ
- তেল - ভাজার জন্য
- কর্নফ্লাওয়ার - ১/২ চা চামচ

স্কুইডের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বর্তমানে বাংলাদেশে মিঠাপানির মাছের পাশাপাশি বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ ও মৎস্যজাত পণ্যের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ তৈরি হয়েছে যেটি আশাব্যাঞ্চক। মৎস্য খাতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমুদ্রকে যথাযথভাবে ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে সহজ প্রাপ্য সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জরিপ ও আহরণের প্রতি বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। সামুদ্রিক স্কুইড তেমনি একটি মৎস্যসম্পদ। পৃথিবীতে ৩০০ প্রজাতির স্কুইডের মধ্যে ৩০-৪০ প্রজাতির স্কুইড অর্থনৈতিকভাবে গুরুতপূর্ণ। আমেরিকা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক বাজারগুলোতে স্কুইডের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি কেজি স্কুইড ৬৫০-৮০০ টাকা দরে বিক্রি হয়। গত এক দশক ধরে স্কুইডের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৎস্য আহরণ কেন্দ্রগুলোতে স্কুইডের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফিনফিসের চেয়ে বর্তমানে স্কুইড ও অন্যান্য সেফালোপডের দিকে মৎস্য চাষী ও ব্যবসায়ীদের আগ্রহ বেশী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শুধুমাত্র স্কুইড ধরার জন্য বাণিজ্যিক জাহাজ ব্যবহার

করা হয়। গত চার দশকে সেফালোপড বিশেষ করে স্কুইড ধরার পরিমাণ চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীজুড়ে সেফালোপড আহরণের পরিমাণ ১৯৭০ সালের আনুমানিক ১ লক্ষ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭ সালে ৪৩ লক্ষ টন হয়। ২০০৯ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৩৫ লক্ষ টন হয় যা পরবর্তীতে ২০১২ সালে ৪০ লক্ষ টনে উন্নিত হয়। আহরণকৃত স্কুইডের মধ্যে ৪৮% ওমাস্ট্রেফিড, ৩০% ললিগনিড ২% গনাটিড এবং ২০% অন্যান্য পরিবারের অর্ন্তভুক্ত।

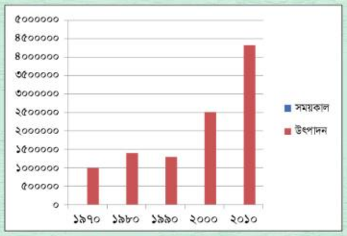

চিত্র ৩. স্কুইডের বৈশ্বিক আহরণ (১৯৭০-২০১২)

আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের কাছে অপরিচিত মৎসসম্পদই অপ্রচলিত মৎস্য সম্পদ। নব্বই এর দশক থেকে নতুনভাবে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ শুরু হয়েছে এবং আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ছয় দশক ধরে যেখানে অন্যান্য মৎস্য আহরণ কমছে সেখানে সেফালোপড আহরণ বিশেষভাবে স্কুইড আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনের অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে স্কুইডের কোন কোন প্রজাতির প্রাপ্যতা বেশি এর উপর জরিপকার্য পরিচালনা করা প্রয়োজন। অদূর ভবিষ্যতে চিংড়ি, কাঁকড়ার পাশাপাশি সী-ইউড, শামুক ঝিনুক এবং স্কুইডও আমাদের খাদ্যাভাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারে। রপ্তানি যোগ্য পণ্য হিসেবেও সংযোজিত হয়ে অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে।

Swimming Crab বা সাঁতারু কাঁকড়ার আহরণ ও সম্ভাবনা

সামুদ্রিক সম্পদ ও জীব বৈচিত্র্যের তুলনামূলক বিচারে একক উপ-সাগর হিসাবে বঙ্গোপসাগর বিশ্বের বৃহত্তম। প্রাচুর্যপূর্ণ জীববৈচিত্র্যের মধ্যে কাঁকড়া একটি উল্লেখযোগ্য সামুদ্রিক সম্পদ। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় প্রায় ১০ প্রজাতির সামুদ্রিক কাঁকড়া সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এসব কাঁকড়ার মধ্যে শীলা কাঁকড়া/Mud Crab এবং সাঁতারু কাঁকড়া/Swimming Crab অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একক আহরণ হিসাবে শীলা কাঁকড়ার উৎপাদন অধিক হলেও সাঁতারু কাঁকড়াও আমাদের সমুদ্রসীমায় যথেষ্ট পরিমাণে ধরা পড়ে। উপকূলীয় এলাকা ও খুলনা-সাতক্ষীরা সংলগ্ন সুন্দরবন অঞ্চল যেমন শীলা কাঁকড়া সমৃদ্ধ অঞ্চল তেমনি কক্সবাজারস্থ নদী মোহনা ও সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা সাঁতারু কাঁকড়া আহরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। যদিও বাংলাদেশে এককভাবে কাঁকড়া আহরণ করা হয় না কিন্তু সমুদ্রে মাছ শিকারের সময় আনুষঙ্গিক মৎস্য পণ্য হিসাবে প্রচুর সাঁতারু কাঁকড়া জালে ধরা পড়ে। আমাদের দেশে কাঁকড়ার জনপ্রিয়তা কম হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ১৯৭৭-৭৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রথম কাঁকড়া রপ্তানি শুরু হয় এবং ১৯৮৩ সালের দিকে এসে হিমায়িত মৎস্য পণ্য রপ্তানিতে কাঁকড়া তৃতীয় স্থানে উঠে আসে। বাংলাদেশ থেকে চীন, জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাঁকড়া রপ্তানি হয়ে থাকে। কাঁকড়া রপ্তানি করে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ২৩.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে।

রেখাচিত্র ১. ২০১১-২০১৬ অর্থবছরে কাঁকড়া রপ্তানি করে আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বাংলাদেশে সাধারনত তিন প্রজাতির সাঁতারু কাঁকড়া পাওয়া যায়। সাগরে বসবাসকারী এই সাঁতারু কাঁকড়াগুলো হল Coral Crab বা শীল কাঁকড়া (*Charybdis feriatus*), Blue Swimming Crab বা নীল সাতারু কাঁকড়া (*Portunus pelagicus*) এবং Three spot Swimming Crab বা তিন ফোঁটা সাতারু কাঁকড়া (*Portunus sanguinolentus*)। স্বাদ আর খাদ্যমান বিচারে এদের মধ্যে Blue Swimming Crab এর চাহিদা ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য বেশি। স্থানীয় জনসাধারন সাঁতারু কাঁকড়াকে বলে ঝাজি কাঁকড়া আর Three spot Swimming Crab কে বলে তিন পইল্লা। সাধারণত মার্চ থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত সাঁতারু কাঁকড়া বেশি ধরা পড়ে তবে মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত আহরণ মাত্রা সর্বোচ্চ। সাধারণত সামুদ্রিক পোয়া মাছ ধরার জাল, বেহুন্দী জাল বা ট্রলারে মাছ ধরার সময় এ সকল সাঁতারু কাঁকড়া মাছের সাথে ধরা পড়ে। আহরিত কাঁকড়ার মধ্যে Blue Swimming Crab-B বেশি আর তা বছরব্যাপিই কমবেশি পাওয়া যায়। *C. feriatus* প্রজাতিটি মূলত প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনের পাথুরে তট সংলগ্ন এলাকায় পাওয়া যায়। *P. pelagicus* এবং *P. sanguinolentus* প্রজাতি দুইটি কক্সবাজার উপকূলে সহজলভ্য। সাগরে এলিফ্যান্ট পয়েন্ট এলাকায় মাছ ধরার সময় জালে প্রচুর পরিমাণে সাতারু কাঁকড়া ধরা পড়ে। শাহ্পরীর দ্বীপ, টেকনাফ, শাপলাপুর, সোনাদিয়া দ্বীপ, মহেশখালী দ্বীপ সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ ধরার জালে প্রচুর সাতারু কাঁকড়া মাছের সাথে আহরিত হয়। কক্সবাজারস্থ বিএফডিসি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও নাজিরারটেক শুটকী পল্লী মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে আহরিত সাঁতারু কাঁকড়া অবতরণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বিদেশে রপ্তানীর পাশাপাশি পোল্ট্রি বা মৎস্য খাদ্য তৈরিতে সাতারু কাঁকড়া ব্যবহৃত হচ্ছে।

সারণি ১. পরিপক্ক সাঁতারু কাঁকড়ার পুষ্টিমান

Crab Species	Protein (%)	Carbohydrate (%)	Fat (%)	Moisture (%)	Ash (%)
Charybdis feriatus (প্রবাল/শীল কাঁকড়া)	২২	৩	০.৬	৭২	২.৪
Portunus pelagicus (নীল সাঁতারু কাঁকড়া)	১৮.২	৫.৩	০.৮	৭৩.৭	২
Portunus sanguinolentus (তিন ফোঁটা সাতারু কাঁকড়া)	১৯.৫	৩.৯	০.৫	৭২.৩	৩.৮

চিত্র ১. *Charybdis feriatus*
(প্রবাল/শীল কাঁকড়া)

চিত্র ২. *Portunus pelagicus*
(নীল সাঁতারু কাঁকড়া)

চিত্র ৩. *Portunus sanguinolentus*
(তিন ফোঁটা সাতারু কাঁকড়া)

সাঁতারু কাঁকড়া কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে আগত পর্যটকদের কাছে খুবই সুপরিচিত। সেন্টমার্টিন দ্বীপে জেটি সংলগ্ন এলাকা ও কক্সবাজারস্থ সুগন্ধা বীচ সংলগ্ন এলাকায় ভোজন প্রিয় পর্যটকদের জন্য বেশ কিছু সী-ফুড ভিত্তিক রেস্তোরা গড়ে উঠেছে, যেখানে এসমস্ত কাঁকড়া সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে বেশ জনপ্রিয়। মার্চ থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত সাঁতারু কাঁকড়া ধরার উপযুক্ত সময়। এ সময় প্রায় ৫০০-৬০০ ছোট নৌকা কাঁকড়া ধরার কাজে কক্সবাজারস্থ সাগর উপকুলে নিয়োজিত থাকে। দিনে ৪-৫ ঘন্টা করে মাসে ২৫-২৬ দিন এসমস্ত নৌকা কাঁকড়া ধরার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাঁকড়া ধরার কাজে বাঁশের তৈরি বিশেষ ধরণের খাঁচা ফাঁদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। স্থানীয় ভাষায় একে চাঁই বলে। সাগর, মোহনা বা উপকূলীয় জলাশয়ের তলদেশে ১৫-২০ কিমি. এলাকায় রশি দ্বারা মাটির সাথে আঁড়াআঁড়ি ভাবে চাঁই স্থাপন করা হয়। চাঁইয়ের ভিতরে টোঁপ (Bait) হিসাবে কামিলা, কুঁচে, চিংড়ি মাছ চপ করে ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ৪. কাঁকড়া ধরার ফাঁদ/চাঁই

চিত্র ৫. প্রচলিত ফাঁদসহ কাঁকড়া ধরার নৌকা

এছাড়াও ৫ সেমি. ফাঁসের তিন থেকে চার হাজার মিটার লম্বা বিশেষ ধরণের মাছ ধরার জাল ১০-১৫ ফুট গভীরতায় কাঁকড়া ধরার কাজে ব্যবহার হয়। ভরা পূর্ণিমার জোয়ার সাঁতারু কাঁকড়া আহরণের উৎকৃষ্ট সময়। গভীর সাগরে মাছ ধরার সময় জালে আহরিত মাছের সাথে প্রচুর সাঁতারু কাঁকড়া ধরা পড়ে। স্থানীয় বাজার না থাকায় যা সাগরে ফেলে দেয়া হয়। কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল থেকে টেকনাফ উপজেলার শাহ্পরীর দ্বীপ পর্যন্ত এবং সোনাদিয়া দ্বীপ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষিত হওয়ায় এ অঞ্চলে এখন আর সাঁতারু কাঁকড়া আহরণ হয় না। তথ্য মতে ২০১১ সালের মার্চ থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত এ অঞ্চলে প্রায় ৭৪.৬৫ মেট্রিক টন সাঁতারু কাঁকড়া অবতরণ করা হয়। এর মধ্যে কক্সবাজারস্থ বিএফডিসি ঘাটে ২৩.৪৮ মেট্রিক টন, শাপলাপুর, টেকনাফ সদর ও শাহ্পরীর দ্বীপে ৪১.৮২ মেট্রিক টন এবং সোনাদিয়া ও মহেশখালি দ্বীপে ৯.৩৫ মেট্রিক টন সাঁতারু কাঁকড়া অবতরণ করা হয়। স্থানীয় মৎস্যজীবী, কাঁকড়া আহরণকারী ও কাঁকড়া ব্যবসায়ীদের দেয়া তথ্যমতে ২০১৭ সালে এসব অঞ্চলে প্রায় ১২০ মেট্রিক টন সাঁতারু কাঁকড়া অবতরণ করা হয় (সারণি-২)। সাধারনত এপ্রিল থেকে জুলাই মাসে গভীর সমুদ্র থেকে এই সাঁতারু কাঁকড়া উপকূলীয় পরিবেশে চলে আসে। এ সময় এরা ওজনেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ধরাও পড়ে বেশি। এ সময় Blue Swimming Crab গড়ে প্রতিটি ৪০০-৪৫০ গ্রাম আর Three spot Swimming Crab গড়ে প্রতিটি ১৫০-২০০ গ্রাম হয়ে থাকে।

সারণি ২. কক্সবাজার অঞ্চলে ২০১৭ সালে সাঁতারু কাঁকড়া অবতরণের পরিমাণ (মে. টন)

অবতরণ কেন্দ্রের নাম	মার্চ ২০১৭	এপ্রিল ২০১৭	মে ২০১৭	জুন ২০১৭	জুলাই ২০১৭	আগস্ট ২০১৭	মোট
শাহ্পরীর দ্বীপ	১.৫	২.৬	৩.৪	২.৩	১.৭	১.২	১২.৭
টেকনাফ সদর	৩.২	৩.৬	৪.৫	৪.০	২.২	১.৮	১৯.৩
শাপলাপুর	৪.৩	৪.৯	৫.৭	৫.২	৩.৭	২.৬	২৬.৪
বিএফডিসি কক্সবাজার	৪.৭	৫.২	৬.১	৬.০	৪.৯	৩.৫	৩০.৪
মহেশখালী	১.৭	২.৪	৩.৭	৩.২	১.৯	১.৩	১৪.২
নাজিরারটেক	২.২	৩.১	৪.২	৩.৯	২.০	১.৬	১৭
মোট	১৭.৬	২১.৮	২৭.৬	২৪.৬	১৬.৪	১২	১২০

সাঁতারু কাঁকড়া স্বভাবে নিশাচর, সাগরের ১০-৬০ মিটার গভীরেই এদের মূল বিচরণক্ষেত্র। সামুদ্রিক সম্পদ, সাঁতারু কাঁকড়ার যথাযথ আহরণের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি তা আমিষ চাহিদা পূরণে রাখতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। স্বাদে অতুলনীয় এবং বিশ্বব্যাপি সমাদৃত এসব কাঁকড়া আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার ভিত্তিতে রপ্তানি করে বাংলাদেশ অর্জন করতে পারে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

বাংলাদেশে রাজ কাঁকড়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

রাজ কাঁকড়া (Horseshoe crab) প্রকৃতপক্ষে কাঁকড়া নয় তবে কাঁকড়ার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত সামুদ্রিক অ্যারাকনিড (Arachnids)। এরা Xiphosura (গ্রীক xiphos, তলোয়ার ও uros, লেজ) বর্গের অর্ন্তভূক্ত। পৃথিবীব্যাপি রাজ কাঁকড়ার ৪টি জীবিত প্রজাতি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের গালফ উপকূল ও আটলান্টিক মহাসাগরে বসবাসরত *Limulus polyhemus;* জাপান, চীন এবং দক্ষিণ সাবাহ (মালয়েশিয়া) অঞ্চলের *Tachypleus tridentatus* এবং বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়শিয়া, চীনসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার *Tachypleus gigas* ও *Carcinoscorpius rotundicauda*। প্রাগৈতিহাসিক এই প্রাণিকে 'জীবন্ত জীবাশ্ম' (Living fossil) নামে অভিহিত করা হয় যা প্রায় ৫৫ কোটি বছর পূর্বে ট্রাইলোবাইট (Trilobite) থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই উন্নত হওয়ায় অঙ্গসংস্থানিক পরিবর্তন ছাড়াই পৃথিবীতে এখনও টিকে আছে। প্রায় ৪০ কোটি বছরেরও পুরানো রাজ কাঁকড়ার জীবাশ্ম যেমন *Mesolimulus walchii* (জার্মানীতে প্রাপ্ত) ও *Austrolimus* (অস্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত) বর্তমানকালের জীবিত প্রজাতিগুলোর প্রায় অনুরূপ। বর্শায় ন্যায় লেজযুক্ত এই চেলিসেরেটদের (Chelicerates) অশ্বখুরাকৃতির কাঁকড়া বলা হয় কারণ এদের পৃষ্ঠীয় প্লেট (Carapace) দেখতে অশ্ব খুরের মতো। পুরুষ রাজ কাঁকড়া আকারে ছোট হওয়ায় সহজেই স্ত্রী কাঁকড়া থেকে এদের পৃথক করা যায় এবং এদের নখরযুক্ত পায়ের (clawed walking legs) স্ফীত প্রোপোডাস (Propodus) সঙ্গমের সময় ক্লাসপার (claspers) হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের রাজ কাঁকড়া

বাংলাদেশে *C. rotundicauda* মোহনা ও মহীসোপান অঞ্চলে দেখা যায় এবং প্রায়শই মাছ ধরার জালে ধরা পড়ে। কক্সবাজার উপকূল, সেন্টমার্টিন, সোনাদিয়া, মহেশখালি এবং সুন্দরবনের নদী ও চরে সচরাচর এটিকে দেখা যায়। *T. gigas* কক্সবাজারস্থ টেকনাফের জোয়ার-ভাটা অঞ্চল ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে পাওয়া যায় তবে সাধারণত সুন্দরবনে দেখা যায় না। রাজ কাঁকড়া সাগরের উষ্ণ, অগভীর উপকূলীয় অঞ্চল ও নদীমুখের ৩০ মিটার গভীরতায় বসবাস করে। যখন প্রজননের জন্য এরা অগভীর পানিতে যায় এবং কাদাময়/বালুময় সৈকতে ডিম ছাড়ে তখন খুব সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব অংশে প্রাপ্ত রাজ কাঁকড়া *C. rotundicauda* বাদামী রঙের হয় যা এদের আবাসস্থলের ওপর নির্ভরশীল। সুন্দরবনে প্রাপ্ত রাজ কাঁকড়া গাঢ় সবুজ অথবা সবুজাভ কালো রঙের হয়। তবে *T. gigas* প্রজাতির দেহ সমভাবে বিস্তৃত ধূসর রঙের পৃষ্ঠীয় অংশ এবং ফ্যাকাসে ধূসর অঙ্কিয় অংশ বালুময় আবাসস্থলের সাথে সহজেই মিশে যায়। *C. rotundicauda* অশ্বখুরাকৃতি কাঁকড়ার মধ্যে সবচেয়ে ছোট। দেহের মোট দৈর্ঘ্য (পুচ্ছ কাটা ব্যাতীত) ১১.৭-১৫.১ সেমি., পুচ্ছ কাঁটা/টেলসনের দৈর্ঘ্য ১৩.২-১৭.৪ সেমি.। *T. gigas* এর দেহের মোট দৈর্ঘ্য ৩৫ সেমি. (সর্বোচ্চ ৫০ সেমি.) ও দেহের ব্যাস ২৫ সেমি.।

জীবনচক্র : রাজ কাঁকড়া ৯-১২ বছর বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। পূর্ণ জোয়ারের সময় এরা প্রজনন করে এবং তখন এরা কক্সবাজার, সোনাদিয়া, মহেশখালি এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপের নিকটে খাড়ি বা জলাভূমির বালুময় সৈকতে ফিরে আসে। সুন্দরবনের চর এলাকা হচ্ছে *C. rotundicauda* এর প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র তবে অন্যান্য সকল উপকূলীয় এলাকায় ২ প্রজাতির রাজ কাঁকড়াই প্রজনন করে থাকে। *C. rotundicauda* বসন্তের শুরুতে (জানুয়ারি থেকে মার্চ) কর্দমাক্ত সৈকতে এবং *T. gigas* গ্রীষ্মের শুরুতে (এপ্রিল-জুন) বালুময় সমুদ্র সৈকতে প্রজনন করে। প্রজনন কালে একটি স্ত্রী ২,০০০ থেকে ৩০,০০০ ডিম ছাড়ে; পুরুষ রাজ কাঁকড়া ডিমগুলোকে নিষিক্ত করে বালুর মধ্যে লুকিয়ে রাখে। *C. rotundicauda* এর ডিমের ব্যাস ২.২৬-২.৪৮ মিমি. এবং *T. gigas* এর ডিমের ব্যাস প্রায় ৩.৫ মিমি.। বড় ডিমের মধ্যে এদের লার্ভাগুলো ছোট লালচে গোলকের মতো দেখায় এবং বাচ্চা ফুটতে ৬ সপ্তাহ সময় লাগে। অতঃপর প্রায় ১৬ বার খোলস পরিবর্তনের মাধ্যমে এরা প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং যৌন পরিপক্কতা লাভ করে। প্রাথমিক অবস্থায় লার্ভাগুলোকে ট্রাইলোবাইটদের মতো দেখায় এবং তাই এদেরকে 'ট্রাইলোবাইট লার্ভা' (Trilobite larvae) বলা হয়। এরা ১২-১৯ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

খাদ্যাভাস : রাজ কাঁকড়া মূলত জৈব আর্বজনাভূক (scavenger) প্রাণি। এদের অধিকাংশই সমুদ্রের তলদেশের কাঁদার মধ্যে বসবাস করে এবং সেখানে এরা ছোট প্রাণি, পোকা-মাকড়, ক্রাস্টাশিয়ান, মোলাস্ক এবং এমনকি ছোট মাছ শিকার করে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এরা প্রধানত নিশাচর। এই নিশ্চল প্রাণিরা খাদ্য সংগ্রহের জন্য কাদা ও বালুর মধ্যে গর্ত করে সময় কাটায়। এরা অত্যন্ত পরিবেশ সহিষ্ণু ও সপ্তাহকালব্যাপি পানি এমনকি খাদ্য ছাড়া বাঁচতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে রাজ কাঁকড়ার ফুলকা অবশ্যই ভিজা থাকতে হবে।

রাজ কাঁকড়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বিংশ শতাব্দির প্রথম অংশে আমেরিকায় রাজ কাঁকড়া সার ও পশু খাদ্য তৈরিতে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হতো। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো যেমন : থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও চীনে রাজ কাঁকড়ার ডিম সুস্বাদু খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। থাইল্যান্ডে রাজ কাঁকড়ার ডিম সমৃদ্ধ খাবার 'Thai cuisine' এবং 'Yum Khai Mengda Talay' নামে পরিচিত যদিও অনেক সময় এই ডিমে Tetrodotoxin নামক এক ধরণের টক্সিন পাওয়া যায় যা অধিকাংশ সময়ই মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়ায়। আবার এই Tetrodotoxin কিছু কিছু রোগ যেমন তীব্র ব্যথা, ক্যান্সার, মাইগ্রেইনসহ Cardiac arrhythmias এর মতো দূরারোগ্য রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ হিসেবে কাজ করে।

পশ্চিমা বিশ্বে এদেরকে নীল রক্তের জন্য সংগ্রহ করা হয়। এদের রক্তে *Limulus amoebocyte lysate* (LAL) নামক এক ধরণের কেমিক্যাল থাকে যা pathogens এবং তাদের endotoxins চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। এই নীল রক্ত মানুষের মানসিক অবসাদ ও আন্ত্রিক পীড়াজনিত রোগ নিরাময়ের ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও উন্নত বিশ্বে এই নীল রক্ত দাঁতের পাল্প তৈরির কাজেও ব্যবহার করা হয়। এদের রক্তের এনজাইম ঔষধ এবং জৈব চিকিৎসা শিল্পে মানুষের জীবন রক্ষার্থে ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ এবং ব্যাকটেরিয়ার প্রোসথেটিক গ্রুপের বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে চিকিৎসা যন্ত্রপাতির এন্ডোটক্সিন দূষণের পরীক্ষায়ও রাজ কাঁকড়া ব্যবহৃত হয়।

সুন্দরবন এলাকার জেলেরা এর লেজের ফাঁপা টুকরা সুতার সাহায্যে মালা বানিয়ে ব্যাথানাশক (যেমন বাত জ্বরের ব্যথা) হিসেবে গলায় ব্যবহার করে। মহেশখালি ও সোনাদিয়া দ্বীপের উপজাতীয় মগরা রাজ কাঁকড়ার ডিম তেলে ভেজে খায়। রাজ কাঁকড়া উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় জৈব-আবর্জনাভোজী বা সর্বভূক খাদক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজ কাঁকড়া মানুষ এবং পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক।

রাজ কাঁকড়ার কৃত্রিম প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনা

রাজ কাঁকড়ার কৃত্রিম প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তেমন কোন বিস্তারিত তথ্য না থাকলেও এটা জানা যায় যে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার থাইল্যান্ড, হংকং, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশে বিরল এই সামুদ্রিক প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য কৃত্রিম প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ কাঁকড়ার চাষ ইনডোর বা আউটডোর দুই পদ্ধতিতেই হতে পারে। শীতকালে যখন সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা ১০° সেন্টিগ্রেডের নিচে নেমে যায় তখন এরা বালির নিচে গর্ত করে লুকিয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, চাষে রাজ কাঁকড়ার খাদ্য গ্রহণের হার পানির তাপমাত্রার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ২০-২৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এরা সর্বোচ্চ হারে খাবার গ্রহণ করে। ৩০° সেন্টিগ্রেড এর বেশি তাপমাত্রায় এবং ১৬° সেন্টিগ্রেড এর কম তাপমাত্রায় এরা আকস্মিকভাবে খাওয়া কমিয়ে দেয়।

বাংলাদেশে রাজ কাঁকড়া একটি বিপন্ন প্রজাতি এবং বিশ্বব্যাপি অতি আহরণ ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে আবাসস্থল ধ্বংসের ফলে এদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় এদেরকে বিপন্ন প্রজাতির তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। রাজ কাঁকড়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব মাথায় রেখে আমাদের দেশে এই সামুদ্রিক প্রাণির প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনার ওপর গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।

সাগর উপকূলে ওয়েস্টার চাষ

বাংলাদেশের ৪৮০ কিমি. দীর্ঘ তটরেখা এবং ১০ লক্ষ হেক্টরের কাছাকাছি বিস্তীর্ণ জলসীমা জুড়ে বিদ্যমান রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক ঝিনুক (Bivalve) সম্পদের সমাহার। সাধারণত বিভিন্ন প্রকারের ঝিনুককে মলাস্ক (Mollusc) নামে অভিহিত করা হয়। অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি ঝিনুক প্রজাতি হচ্ছে ওয়েস্টার। ওয়েস্টারকে গুগলি ও শুক্তি নামে অভিহিত করা হয় এবং স্থানীয়ভাবে উপকূলে এটিকে 'কস্তুরা' বা 'কস্তুরী' বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রজাতির ওয়েস্টার সরাসরি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অর্থনৈতিকভাবে ওয়েস্টারের গুরুত্ব অপরিসীম যেটির বিজ্ঞানসম্মত ও প্রযুক্তি ভিত্তিক চাষের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। প্রাকৃতিকভাবে এই মূল্যবান ওয়েস্টার সম্পদের যথাযথ উন্নয়ন করা সম্ভব হলে অদূর ভবিষ্যতে এটি দেশের একটি অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ওয়েস্টার ও ঝিনুক ছাঁকুনি খাদক (Filter feeder) ও উপবিষ্টকারী (Sedentary) জীব যা প্রস্তর শিলা, কাঠ ও কনক্রিটের গঠন, নুড়ি, ইট, খোসা, গাছের গুড়িসহ যে কোন শক্ত বস্তুর উপর জোয়ার-ভাটা সংলগ্ন অঞ্চলে জন্মায়। অধিকাংশ ওয়েস্টার প্রজাতি স্বল্প লবণাক্ততা (১৭-৩৫ পিপিটি) সহিষ্ণু বিধায় লোনাপানি, মোহনা অঞ্চল এবং জলাভূমিতে এদেরকে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সেন্টমার্টিন, মহেশখালী, কক্সবাজার, টেকনাফ ও উপকূলবর্তী মোহনা অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির ওয়েস্টারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সেন্টমার্টিন দ্বীপের সমগ্র প্রবাল শিলা জুড়ে প্রচুর পরিমাণে ওয়েস্টার পাওয়া যায়। নিম্নের ছকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ওয়েস্টারসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

Group	Family	Bengali name	English name	Scientific name
Edible oyster	Ostreidae	Kostura	Coral Rock Oyster	*Saccostrea cucullata*
		Kostura	Cupped Oyster	*Crassostrea* sp.
		Kostura	Oyster	*Crassostrea madrasensis*
Pearl oyster	Pteriidae	Kostura	Rayed Pearl Oyster	*Pinctada fucata*
		Kostura	Blacklip Pearl Oyster	*Pinctada margaritifera*
		Kostura	Pearl Oyster	*Pinctada anomioides*
		Kostura	Pearl Oyster	*Pinctada atropurpurea*
		Kostura	Pearl Oyster	*Pinctada maxima*
		Kostura	Rayed Pearl Oyster	*Pinctada martensis*
	Placunidae	Sada chilon	Windowpane Oyster	*Placuna placenta*

চিত্র ১. *Placuna placenta*

চিত্র ২. *Crassostrea madrasensis*

চিত্র ৩. *Pinctada margaritifera*

চিত্র ৪. *Pinctada fucata*

ওয়েস্টার ঝিনুকের গুরুত্ব

খাদ্য হিসেবে : যদিও বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার অধিকাংশ ধর্মীয় কারণে ওয়েস্টার, ঝিনুক ভক্ষণে অভ্যস্ত নয় কিন্তু চট্টগ্রামের উপজাতি গোষ্ঠী ও উপকূলবর্তী রাখাইন সম্প্রদায়, অধিকাংশ সংখ্যালঘু পৌত্তলিক সম্প্রদায় এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের মাঝে ওয়েস্টারের মাংসল অংশ সুস্বাদু খাবার হিসেবে বিবেচিত। ওয়েস্টার ঝিনুক অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য যাতে প্রচুর পরিমাণে আমিষ, খনিজ ও ভিটামিন রয়েছে। এ ছাড়াও ওয়েস্টারে উচ্চমাত্রায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে যেগুলো নিশ্চিতভাবে হার্ট এ্যাটাক, স্ট্রোক এবং নিম্ন রক্ত চাপের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। আমেরিকান ও ইতালির গবেষকরা ওয়েস্টারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যামাইনো এসিডের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ওয়েস্টার খেলে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো ও সহায়ক কোলেস্টরলের মাত্রা বেড়ে যায় এবং ক্ষতিকর কোলেস্টরলের মাত্রা কমে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন, চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, আমেরিকা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জর্ডান, কুয়েত, সৌদি-আরব, বাহরাইন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত সকল দেশে ওয়েস্টার একটি অন্যতম সামুদ্রিক খাদ্য (Seafood) হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়। আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স এবং অস্ট্রেলিয়াতে ওয়েস্টার অতি জনপ্রিয় হওয়ায় এই দেশগুলোতে বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক ওয়েস্টার বার গড়ে উঠেছে।

অলঙ্কার উৎপাদনে : ওয়েস্টার-ঝিনুক থেকে সাদা উজ্জ্বল বর্ণের মুক্তা পাওয়া যেটি বাণিজ্যিকভাবে অনেক মূল্যবান। মিঠাপানির ঝিনুক চাষ করে মুক্তা ও ইমেজ মুক্তা উৎপাদনে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সফলতা লাভ করেছে। একইভাবে আমাদের সামুদ্রিক জলসীমায় মুক্তা উৎপাদনকারী ওয়েস্টার প্রজাতি বিদ্যমান থাকায় আমাদের মুক্তা চাষ শিল্প আরো সমৃদ্ধ করার সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ওয়েস্টারের শক্ত খোলস থেকে হাতে তৈরি বিভিন্ন ধরণের আকর্ষনীয় নকশার অলঙ্কার তৈরি হয়ে থাকে যা চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ করে উপকূলীয় শহর কক্সবাজার, পতেঙ্গা, মহেশখালী, এবং টেকনাফের বিভিন্ন বিপনীতে বিক্রয় করা হয়।

শিল্প কারখানায় : ওয়েস্টারের শক্ত খোলস হতে চুন তৈরি করা হয়, এবং ক্যালসিয়াম-অক্সাইড নিষ্কাশন করা হয় যা ঢালাই লৌহ শিল্পে লোহার প্রক্ষেপন ও সংকোচনে ব্যবহার করা হয়। আধুনিক ও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত লবণকে দৃঢ়তা প্রদানের কাজেও ক্যালসিয়াম-অক্সাইড ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া চিনি ও কাগজ শিল্পে এবং ওষুধ শিল্পেও ওয়েস্টারের উপকরণসমূহ বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পরিবেশের সহায়ক উপাদান হিসেবে : ওয়েস্টার মাটি ও পানি থেকে এ্যালকালির মাত্রাকে কমিয়ে দিয়ে জলজ পরিবেশকে মারাত্মক দূষণের হাত থেকে রক্ষা করে। পৃথিবীব্যাপি চাষকৃত ওয়েস্টার বাৎসরিক সমুদ্রের পানি থেকে ১২৩০ টনেরও অধিক কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে নিয়ে গ্রীনহাউস এর প্রভাবকে প্রশমিত করে। এছাড়াও ওয়েস্টার পানির প্ল্যাঙ্কটন ব্লুমকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পানিতে ভাসমান তৈলাক্ত উপাদানকে বিশোধন করে জলজ প্রাণিদের মৃত্যুর হুমকি থেকে রক্ষা করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ওয়েস্টার চাষের জন্য সৃষ্ট কৃত্রিম ডুবোচর (Artificial reef) কমপক্ষে ৩৪ প্রজাতির মাছ, ১১ প্রজাতির কাঁকড়া এবং ১৬ প্রজাতির চিংড়ির নিরাপদ আবাসস্থলের নিশ্চয়তা দেয়। ওয়েস্টার চাষের বেড (Oyster bed) তৈরির জন্য সৃষ্ট কৃত্রিম ডুবোচর প্রাকৃতিকভাবে সরাসরি উপকূলীয় বাঁধকে জোয়ার এবং ঢেউয়ের কারণে সৃষ্ট ক্ষয় ও ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা করে।

বাংলাদেশে ওয়েস্টার চাষ

ওয়েস্টার পানিকে ছেঁকে পানি পরিষ্কারক হিসেবে ভূমিকা রাখে তাই বলা যায় যে, ওয়েস্টার চাষ পরিবেশ-বান্ধব। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল যেমন. কক্সবাজার ও টেকনাফে নব্বইয়ের দশকে পরীক্ষামূলকভাবে ওয়েস্টার চাষের উপর কিছু গবেষণা করা হয়। বাংলাদশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক মৎস্য এবং প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার কর্তৃক ক্যাপটিভ পরিবেশে ওয়েস্টারসহ সামুদ্রিক ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদনের উপর গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এবং আংশিক সফলতাও অর্জিত হয়েছে। তাছাড়া, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও নেদারল্যান্ডের ওয়েজনিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে কক্সবাজারের কুতুবদিয়া ও মহেশখালী চ্যানেলে প্রকৃতি থেকে ওয়েস্টারের লার্ভি/স্প্যাট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আবাসস্থল সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ভিত্তির (substratum) যথার্থতা নিরূপণ এবং প্রাকৃতিক ওয়েস্টার ডুবোচর সৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় ভূমিক্ষয় প্রশমনে এর প্রভাবের উপর গবেষণা পরিচালনা করে। সাম্প্রতিককালে ওয়েস্টারের সমগোত্রীয় প্রজাতি সবুজ ঝিনুক চাষের সম্ভাবনা নিয়ে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এ্যানিম্যাল সায়েন্সস বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ কর্তৃক স্বল্প পরিসরে পরীক্ষামূলক গবেষণা চলমান রয়েছে। বর্তমানে যে মাত্রায় ওয়েস্টার আহরণ করা হয় তা মোট প্রাকৃতিক উৎপাদনের অনেক নিচে রয়েছে এবং পুরোটাই প্রাকৃতিক মজুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কারণ দেশে এখনও বাণিজ্যিকভাবে ওয়েস্টার চাষ শুরু হয়নি।

বিশ্বব্যাপি মুক্তা উৎপাদনকারী ওয়েস্টার ঝিনুকের চাষ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হিসেবে ওয়েস্টার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। বাংলাদেশের জলবায়ু, মাটির রাসায়নিক গঠন, বিদ্যমান জলীয় ও তাপমাত্রার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ওয়েস্টার চাষের জন্য খুবই অনুকূল। আমাদের উপকূলজুড়ে প্রাকৃতিকভাবেই প্রচুর পরিমাণে ওয়েস্টার লার্ভি/স্প্যাট এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক খাবারের উপরে নির্ভরশীল হওয়াতে এদের কোন আলাদা খাবার দিতে হয় না। ওয়েস্টার স্প্যাট সংগ্রহ করার জন্য যে কালচেস (Cultches) প্রয়োজন হয় সেটি তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন : খালি খোলস, বাঁশ এবং মৃত্তিকার ইষ্টক (Clay brick) সহজে প্রাপ্য ও স্থানীয়ভাবে প্রচুর বিদ্যমান। পৃথিবীর অনেক দেশ যেমন : ফ্রান্স, চীন, জাপান, ফিলিপাইন, কোরিয়া এবং ডেনমার্ক ওয়েস্টারের শৃঙ্খলাবদ্ধ (Systematic) প্রজনন ও চাষের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এ সকল দেশের মত বাংলাদেশও উপকূলীয় কক্সবাজার এবং সুন্দরবন এলাকায় ওয়েস্টারের মূল্যবান প্রজাতিগুলোর প্রজনন ও চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। উপকূলীয় এলাকায় বাগদা চিংড়ির চাষ যেভাবে বাংলাদেশের জন্য বয়ে এনেছে সাফল্য তেমনি যুগোপযোগী সাফল্য বয়ে আনতে পারে ওয়েস্টার চাষ। কেবলমাত্র উপকূলীয় সোনাদিয়া এবং মহেশখালী চ্যানেলের মধ্যে ওয়েস্টার চাষের জন্য ১,৫০০ হেক্টরেরও বেশি সম্ভাবনাময় এলাকা বিদ্যমান রয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক লবণাক্ত জলাভূমিতে সহজ পদ্ধতিতে চাষযোগ্য এবং খামার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ অপেক্ষাকৃত কম বিনিয়োগ সাধ্য হওয়ায় একজন কৃষক ওয়েস্টার চাষ করে সহজেই লাভবান হতে পারে। ওয়েস্টার ঝিনুক প্রধানত সরাসরি তলদেশে নিমজ্জিত (Bottom culture) বা অধঃ নিমজ্জিত (Off-bottom), ভাসমান ভেলায় (Raft culture), খাঁচায়, লং লাইন (Long-line), কাঁঠ, বাঁশ অথবা লোহার তৈরি তাক/আলনা (Rack culture) এবং খুঁটি (Stake culture) সহ যেকোন অবকাঠামোতে চাষ করা যায়। প্রাকৃতিক উৎস হতে স্প্যাট (Spat ২-৩ সপ্তাহ বয়স, যে অবস্থায় বীজগুলো কোন কাঠামোতে সংযুক্ত হয়) সংগ্রহ করার পর উপযুক্ত যায়গায় চাষের জন্য স্থাপন করা হয়। এক হতে দেড় বছরের মধ্যে এরা বাজারজাতকরণের উপযোগী (৬-১৩ সেমি.) হয়ে ওঠে। তাই বাংলাদেশে ওয়েস্টার ঝিনুকের আধুনিক চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন ও বিস্তারের লক্ষ্যে এখনই গবেষণা শুরু করা প্রয়োজন। আশা করা যায়, পরিবেশ-বান্ধব ওয়েস্টার চাষ ও সংগ্রহ পরবর্তী প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি, প্রাকৃতিক ওয়েস্টার সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে অচিরেই ওয়েস্টার চাষ উপকূলীয় জনসাধারণের টেকসই খাদ্যের উৎস ও সম্ভাব্য আয়ের খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

বাংলাদেশের বাহারী মাছ

মৎস্য প্রজাতির বৈচিত্র

পৃথিবীর মোট আয়তনের তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল। এই বিশাল জলারাশিতে আকার-আকৃতিতে, ওজনে, জীবনচক্রে, দৈহিক গঠন এবং রঙ্গে বৈচিত্রপূর্ণ মাছ বসবাস করে। মাছ হচ্ছে পৃথিবীর সমুদয় মেরুদন্ডী প্রাণির অর্ধেক। পৃথিবীর মহাসাগর, সাগর, মোহনা, হ্রদ, নদী, হাওড়, বাঁওড়, খাল-বিল ও পুকুরে এখন পর্যন্ত ৩১,৬০০ প্রজাতির টেলিয়স্ট মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। মাছ প্রায় সব ধরণের জলাশয় যেমন গরম পানির ঝর্ণা যেখানে পানির তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর বেশী সেখানেও বসবাস করে (*Sarotherodon grahami* পূর্ব আফ্রিকার লেক মাগাদিতে পাওয়া যায়)। আবার উত্তর মেরুর সাইবেরিয়া ও আলাস্কার বরফের নীচের পানিতে যেখানে পানির তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস এর নীচে সেখানেও মাছ বসবাস করে (আলাস্কা ব্ল্যাকফিশ, *Dallia pectoralis*)। মাছের উলম্ব বিস্তারে সমুদ্র সমতল হতে ৫ কিলোমিটার উর্দ্ধে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১১ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। মাছ ৫ কিমি. উচ্চতায় অবস্থিত পাহাড়ি লেকে (যেমন: *Schizothorax plagiostomus*), ১১ কিমি. গভীর প্রশান্ত মহাসাগরের মেরিয়ানা ট্রেঞ্চ নামক গভীর খাদে (যেমন: *Ateleopus japonicus*), বদ্ধ জলাশয়ে (যেমন: *Cyprinus carpio*), দ্রুত প্রবাহমান নদীতে (যেমন: *Tor tor*), পাহাড়ি ঝর্ণায় (যেমন: *Danio dangila*), বরফ-গলা নদীতে (যেমন: *Schizothorax richardsonii*), এমনকি মহাসাগরের গভীর খাদ (যেমন: মেরিয়ানা ট্রেঞ্চ), যেখানে কোন আলো নাই সেখানেও বসবাস করে। কিছু মাছ যেমন: মাড মিনু (*Umbra limi*) ও ইয়েলো পার্চ (*Perca flavescens*) খুব কম পিএইচ (৩.২-৪.১) ও অক্সিজেন (১-২ পিপিএম) সম্পন্ন পানিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। ডিম পাড়া ও বাচ্চা দেয়া উভয় প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। বেশিরভাগ মাছ ডিম পাড়ে কিন্তু অনেক মাছের প্রজাতি সম্পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বাচ্চা প্রসব করে। যদিও যেসব মাছ ডিম পাড়ে বা বাচ্চা দেয় সবাই ডিম উৎপন্ন করে থাকে। পার্থক্য শুধু এই ডিম উৎপন্ন করার পর ডিমের পরিস্ফুটন কোথায় হবে। বাচ্চা বহনকারী মাছের ডিম আভ্যন্তরিণ পরিস্ফুটন হয়। ডিম পাড়া মাছের ডিমের পরিস্ফুটন বাহিরের পরিবেশে হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের মিঠাপানি যেমন নদী, হাওড়, বাঁওড়, খাল, বিল ও পুকুরে ২৬০ প্রজাতির এবং সাগর ও মোহনায় ৪৭৫ প্রজাতির মাছ রয়েছে। এই বিশাল মৎস্য ভান্ডারের মাঝে রয়েছে অনেক প্রজাতির বাহারী মাছ (ornamental fish)। বাংলাদেশে প্রাপ্ত ৬৬ প্রজাতির মাছ একুইরিয়াম মাছ হিসাবে ব্যবহৃত হয় (সারণি ১)। মিঠাপানির বাহারী মাছ যেমন: পৃষ্ঠদেশ সবুজাভ ধুসর ও বক্ষদেশ সাদাটে বর্ণের কাকিলা মাছ (Freshwater Niddle Fish: *Xenentodon cancila*), শরীরের উর্ধাংশ সবুজাভ, নিম্নাংশ সাদাটে, পাখনা হলুদাভ ও কমলা রঙের মার্জিন বিশিষ্ট কানপোনা মাছ (Blue Panchax: *Aplocheilus panchax*), উর্ধাংশ সবুজাভ ও নিম্নাংশ সাদাটে শরীর বিশিষ্ট বেচি কানপোনা (Green Panchax: *Oryzia melastigma*), পিঠের দিকে বাদামি নিচের দিক ক্রমশ হালকা ও গায়ে ৮-৯ টি খাড়া কালো দাগ বিশিষ্ট টাকি মাছ (Spotted Snakehead: *Channa punctatus*), দেহের উপরের দিক জলপাই সবুজ, চোখ থেকে লেজ পর্যন্ত মধ্য শরীর বরাবর কালো দাগ, নিম্নাংশ হলুদাভ সাদা শরীর বিশিষ্ট দারকিনা (Flying barb: *Esomus danricus*), গায়ের রং হালকা বাদামি ও নিচের দিকে রূপালি বর্ণের মাছ জয়া (Jaya: *Aspidoparia jaya*), দেহের উপরের দিকের রং ইষৎ বাদামি, নিম্নভাগ রূপালি ও পাশে খাড়া ২-৩ সারি নীল দাগ বিশিষ্ট পাহাড়ি নদীর নুড়িযুক্ত তলদেশে প্রাপ্ত পাথরচাটা/তিলা কোকশা মাছ (Tileo Baril: *Barilius tileo*), দেহের উপরের দিকের রং হালকা সাদা, নিম্নভাগ রূপালি ও পাশে খাড়া ১১-১৬ সারি নীল দাগ বিশিষ্ট শরীর পাহাড়ি নদীর নুড়িযুক্ত তলদেশে প্রাপ্ত বৈরালি/কোকশা মাছ (Baril: *Barilius barila*), উপরের দিকটা সবুজাভ ও নিচের দিকটা রূপালী এবং পিছনের দিকে নীল ও হালকা কমলা রঙের লম্বা ডোরা বিশিষ্ট দিবারি/ছেবলি মাছ (Sind Danio: *Danio devario*), শরীরে চারটি লম্বালম্বি ধাতব নীল ডোরা/ব্যান্ড ও ৩টি সরু রূপালি ডোরা বিশিষ্ট আঞ্জু (Anju: *Brachydanio rerio*), সবুজাভ রূপালী শরীর, রূপালী সাদা পেট ও ২টি খাড়া ডোরা বিশিষ্ট ফুটানি পুঁটি (Spotted barb: *Puntius phutunio*), পৃষ্ঠ উজ্জ্বল জলপাই সবুজ, পার্শ্ব ও উদর লাল আভাযুক্ত রূপালী এবং লেজের সম্মুখে কালো বড় দাগ বিশিষ্ট কাঞ্চন পুঁটি (Rosy barb: *Puntius conchonius*), দেহ রূপালী ও পার্শ্বরেখা অঙ্গে ২টি কালো দাগ বিশিষ্ট তিত পুঁটি (Ticto barb: *Puntius ticto*), দেহ লালাচে বাদামি, পুচ্ছ পাখনা থেকে একটু দূরে লেজে ১টি কালো ডোরা এবং পায়ু ও পৃষ্ঠ পাখনার সম্মুখ ভাগে কালো দাগ বিশিষ্ট গিলি পুঁটি

(Golden barb: *Puntius gelius*), পৃষ্ঠ ধাতব সবুজ, পার্শ্ব সবুজাভ রূপালি, নিচের দিক হালকা লালচে বা বেগুনি আভাযুক্ত, পুচ্ছ পাখনা বরাবর একটি রূপালি কালো দাগ এবং কানকোয়ার অবব্যহিত পরেই আরো একটি কালো দাগ বিশিষ্ট টেরি পুঁটি (Onespot barb: *Puntius terio*), দেহের উপরিভাগ হালকা বাদামী, নিচের দিক ইষৎ হলদে, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে কয়েকটি বাদামী ডোরা এবং পুচ্ছ পাখনায় কালো দাগ বিশিষ্ট পাহাড়ি গুতুম (Gongota loach: *Somileptes gongota*), শরীরে ৭-৮ টি খাড়া গাঢ় বাদামী, প্রতিটি বাদামি ডোরার পাশ্বে ১টি হলদে ডোরা এবং পুচ্ছ পাখনায় ২-৩ টি বা অধিক ডোরা/ব্যান্ড বিশিষ্ট রাণী মাছ (Bengal loach: *Botia dario*), হলুদাভ শরীর, ধুসর বর্ণের আড়াআড়ি ৬-৭টি ডোরা বিশিষ্ট বেটি মাছ (Reticulate loach: *Botia lohachata*), পৃষ্ট গাঢ় বাদামী, নিচের দিক হলুদাভ, হালকা কালো ডোরা পুচ্ছ পাখনার গোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত এবং উপরে নিচে সারিবদ্ধ অনেক দাগ বিশিষ্ট গুতুম মাছ (Guntea loach: *Lepidocephalus guntea*), পৃষ্ঠ হালকা বাদামী, পার্শ্বদেশ রূপালী, নিচের দিক সাদাটে এবং পার্শ্ব রেখা বরাবর ৯-১০টি অনিয়মিত বাদামী দাগ ও লেজের গোড়ার ১টি গাঢ় কালো ফোঁটা বিশিষ্ট পুঁইয়া মাছ (Annandale loach: *Lepidocephalus annandalei*), উর্ধাংশ ধূসর ও নিম্নাংশ হলুদাভ সাদা এবং পার্শ্ব রেখা বরাবর নীলাভ বর্ণের দাগ বিশিষ্ট কাবাসী/গুলশা টেংরা (Gangetic mystus: *Mystus cavasius*), গায়ের রং সবুজ থেকে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের শরীরসহ কাঁধে ১টি গভীর কালো দাগ এবং গায়ে গাঢ় বাদামী রঙের লম্বালম্বি ৪-৫টি ডোরা বিশিষ্ট বুজুরী টেংরা (Striped Dwarf Catfish: *Mystus tengara*), উর্ধাংশ সবুজাভ/ধূসর বাদামি ও নিম্নাংশ হলুদাভ,পার্শ্ব রেখার উপর বরাবর ১টি উজ্জ্বল ডোরা এবং ৩-৯ টি কালো ফোঁটা বিশিষ্ট তাঁরা বাইম (Lesser Spiny Eel: *Macrognathus aculeatus*), পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব গাঢ় বাদামী রঙের এবং নিম্নাংশ হলুদাভ শরীর বিশিষ্ট শাল বাইম (Zig zag Eel: *Mastacembelus armatus*), শরীরের উর্ধাংশ ইষৎ সবুজ-বাদামি ও নিম্নাংশ ময়লা সাদা বিশিষ্ট খলিশা মাছ (Banded Gourami: *Colosa fasciatus*), দেহ লালচে, ফ্যাকাশে নীল রঙের আড়াআড়ি তীর্যক ডোরা ও পাখনায় লালচে দাগ বিশিষ্ট লাল খলিশা (Dwarf Gourami: *Colisa lalius*), গায়ে বাদামি-কালো রং ও চোখ থেকে পুচ্ছ পাখনার গোড়া পর্যন্ত রূপালী-সাদা দাগ বিশিষ্ট নাপিত/নাপতানি/মধুমালা/বেউকুল মাছ (Frail Gourami: *Ctenops nobilis*), গায়ের রং ইষৎ সবুজ-বাদামি, ৩টি খাড়া কালচে ডোরা দাগ ও পাখনায় সরু ডোরা বিশিষ্ট মেনি/ভেদা মাছ (Mud Perch: *Nandus nandus*), গায়ের রং কালচে অথবা গাঢ় বাদামি এবং পুচ্ছ পাখনা ও কানকোয়ার গোড়ায় ১টি করে কালচে নীল ফোঁটা বিশিষ্ট নাপিত কই/কই বান্দি (Badis: *Badis badis*), দেহ কমলা হলুদ, তিনটি খাড়া কালচে দাগ এবং লালচে রঙের পৃষ্ঠ, শ্রেণী, পায়ু ও পুচ্ছ পাখনা বিশিষ্ট লাল চান্দা (Highfin Glassy Perchlet: *Parambassis lala*) ইত্যাদিসহ আরো অনেক মাছ বাহারী মাছ হিসেবে পরিচিত।

আমদানিকৃত বাহারী মাছ

একুইরিয়াম ফিশ হিসেবে ব্যবহারের জন্য দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, অফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ১৬টি পরিবারের ৫৭টি গণের ৯৩টি প্রজাতির বাহারী মাছ বাংলাদেশে আনা হয়েছে। যদিও একুইরিয়াম ফিশের ব্যবসা বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত নয় এবং এই সমস্ত মাছ আমদানির সময় কোন কোয়ারেনটাইন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নাই। একুইরিয়াম ফিশ হিসেবে ব্যবহারের জন্য Loricariidae ফ্যামিলির সাউথ আমেরিকান সাকার মাউথ ক্যাটফিশ *Hypostomus punctatus* বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তিতে জনৈক বিদেশী একুইরিয়াম থেকে গুলশান লেকে তা ছেড়ে দেয়, ফলস্বরূপ আজ সারা বাংলাদেশের পুকুর ও খালে সাকার মাউথ ক্যাটফিশ বিস্তৃতি লাভ করেছে। Poeciliidae ফ্যামিলির ৫টি প্রজাতির বিদেশী বাহারী মাছ একুইরিয়ামে ব্যবহারের জন্য আমাদের দেশে আমদানি করা হয়েছে। Poeciliidae ফ্যামিলির মাছ বাচ্চা দেয়। উত্তর আমেরিকা থেকে আনা হয়েছে ১টি প্রজাতি নাম গাপ্পি, *Poecilia reticulata* এবং মধ্য আমেরিকা থেকে ৪টি প্রজাতি যেমন: ব্ল্যাক মোলি (*Poecilia sphenops*), সেইলফিন মোলি (*Poecilia velifera*), সোর্ড টেইল (*Xiphophorus helleri*) ও প্লেইটি (*Xiphophorus maculatus*)। এই সব প্রজাতির মাছ আকারে খুব ছোট প্রায় ১-২ ইঞ্চি সাইজের হয়ে থাকে। এরা লার্ভিভোর (Larbivore), মশার লার্ভি খেয়ে মশা নিয়ন্ত্রণ করে। গোল্ডফিশ (*Carassius auratus*) চীন থেকে আমদানি করা একটি বাহারী মাছ, যার লাল লেজ একুইরিয়ামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। গোল্ড ফিশ বর্তমানে আমাদের দেশে খুব জনপ্রিয় একুইরিয়াম মাছ। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন খামারী এই মাছের চাষ ও পোনা উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত। একুইরিয়ামে বাহারী মাছ হিসাবে ব্যবহারের জন্য Cyprinidae পরিবারের মোট ১৭ প্রজাতির মাছ আমাদের দেশে আমদানি করা হয়েছে।

Characidae পরিবারের ব্লাডফিন টেট্রা প্রজাতির মাছগুলো (*Aphyocharax rubripinnis*) আকারে ছোট প্রায় ৫ সেমি. এর কাছাকাছি হয় যা আমাদের দেশের মলা মাছের মত দেখতে কিন্তু লেজ ও ফিন গুলো রক্তলাল যা একুইরিয়ামের শোভা বাড়ায়। কার্ডিনাল টেট্রা (*Cheirodon axelrodi*) Characidae পরিবারের আরেক প্রজাতির ছোট মাছ যার শরীরে চোখের পর থেকে লেজ পর্যন্ত গাঢ় লাল ও নীল রং এর ব্যান্ড আছে যা দেখতে খুবই সুন্দর। Characidae পরিবারের মোট ১৩টি মাছ আমাদের দেশে আমদানি করা হয়েছে।

সরকারি অনুমোদন ছাড়াই Characidae পরিবারের আমাজন নদীর লাল পিরানহা (*Serrasalmus nattereri*) এবং পিরাপিটিংগা (*Piaractus brachypomus*) মাছ আমাদের দেশে আমদানি করা হয়েছে। এই মাছটি রাক্ষুসী স্বভাবের। আমাজন নদীর যে স্থানে রেড পিরানহা মাছ থাকে সেই স্থানে মানুষ নামা নিষেধ কারণ এই মাছ মানুষের জন্য বিপদজনক। বর্তমানে সরকারিভাবে এই মাছ পুকুরে বা একুইরিয়ামে রাখা নিষেধ। একুইরিয়াম মাছ হিসেবে ব্যবহারের Schilbeidae পরিবারের Glass catfish আমাদের দেশে আমদানি করা হয়েছে। এই মাছটির গোঁফ আছে ও এর শরীর কাঁচের মত স্বচ্ছ, ফলে ভিতরের শরীরের গঠনটা পরিষ্কার দেখা যায়। একুইরিয়ামে এই মাছটা অদ্ভুত সুন্দর লাগে। মনে হয় মাছের কংকাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে খুব সুন্দর অনেক প্রজাতির বিদেশী বাহারী মাছ একুইরিয়ামে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশে আমদানি করা হয়েছে।

বাহারী মাছের বাণিজ্যিক ব্যবহার

মাছ একটি নবায়নযোগ্য জলজ সম্পদ যাহা পৃথিবীর অনেক দেশে খাদ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সহায়তা করে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশের মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় হলো আভ্যন্তরিণ মৎস্যসম্পদ। অপর দিকে ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় স্পোর্টস ফিসিং হিসাবে আভ্যন্তরিণ মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে একুইরিয়ামে ব্যবহৃত মাছসমূহ প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে ধরা হয়। কিছু কিছু প্রজাতির মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশলও উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রজাতি, আকার, রং ভেদে মাছের মূল্য নির্ধারিত হয়। দেশি প্রজাতির প্রতিটি মাছের মূল্য সাধারণত ৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু বিদেশী অনেক মাছের মূল্য ৫০০ থেকে ২০০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ঢাকার কাঁটাবন, টঙ্গি, চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা, খুলনার খালিশপুর, যশোরের চাচড়া, ফেনীর মহিপাল ও ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বাণিজ্যিকভাবে একুইরিয়াম মাছের উৎপাদন, চাষ ও বিপনন করা হয়ে থাকে। এদেশে বাহারী মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করে এই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক বাজারে বাহারী মাছ রপ্তানির ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন করাও জরুরী। বর্তমানে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, তাইওয়ান, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভারত ও শ্রীলংকা আন্তর্জাতিক বাজারে বাহারী মাছ রপ্তানি করে থাকে। তাছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, বলিভিয়া, চিলি, জামাইকা, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি দেশও আন্তর্জাতিক বাজারে বাহারী মাছ রপ্তানি করে থাকে। বাংলাদেশের রংবেরং এর বাহারী মাছ আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করে বৈদিশেক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

সারণি ১. বাংলাদেশে বাহারী মাছ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য স্থানীয় প্রজাতির মাছের তালিকা

	Family/Scientific name	Common name	বাংলা নাম	RG	RG
	Tetraodontidae				
1.	*Tetraodon cutcutia*	Ocellated Puffer Fish	পটকা মাছ	Ph	Carnivore
2.	*Tetraodon fluviatilis*	Green Puffer Fish	সবুজ পটকা মাছ	Ph	Carnivore
	Belonidae				
3.	*Xenentodon cancila*	Freshwater Niddle Fish	কাকিলা মাছ	Br	Carnivore
	Hemirhamphidae				
4.	*Dermogenys pussilus*	Freshwater Half beak	এক ঠুইট্টা মাছ	Lb	Carnivore
	Aplocheilidae				
5.	*Aplocheilus panchax*	Blue Panchax	কানপোনা মাছ	Lb	Larbivore
6.	*Oryzia melastigma*	Green Panchax	বেচি কানপোনা	Lb	Larbivore
	Channadiae				
7.	*Channa barca*	Barca Snakehead	পিপলা/ তিলা শোল	Gr	Carnivore
8.	*Channa punctatus*	Spotted Snakehead	টাকি মাছ	Gr	Carnivore
9.	*Channa orientalis*	Walking Snakehead	চ্যাঙ টাকি	Gr	Carnivore
	Cyprinidae				
10.	*Esomus danricus*	Flying barb	দারকিনা	Ph	Omnivore
11.	*Aspidoparia jaya*	Jaya	জয়া	Ph	Omnivore
12.	*Bengala elonga*	Bengala barb	রাজবরা	Ph	Omnivore
13.	*Rasbora rasbora*	Gangetic Scissortail Rasbora	লুইজ্জা দারকিনা	Ph	Planktivore
14.	*Rasbora daniconius*	Slender Rasbora	দারকিনা	Ph	Planktivore
15.	*Barilius tileo*	Tileo Baril	পাথরচাটা/তিলা কোকশা মাছ	Ph	Insectivore
16.	*Barilius barila*	Baril	বৈরালি/ কোকশা মাছ	Ph	Insectivore
17.	*Barilius barna*	Baril	বানি কোকশা	Ph	Insectivore
18.	*Danio dangila*	Danio	নিপাতি	Ph	Omnivore
19.	*Danio devario*	Sind Danio	দিবারি/ছেবলি মাছ	Ph	Omnivore
20.	*Brachydanio rerio*	Anju	আঞ্জু	Pl	Omnivore
21.	*Puntius guganio*	Glass barb	মলাপুঁটি	Ph	Omnivore
22.	*Puntius phutunio*	Spotted barb	ফুটানি পুঁটি	Ph	Omnivore

	Family/Scientific name	Common name	বাংলা নাম	RG	RG
23.	*Puntius conchonius*	Rosy barb	কাঞ্চন পুঁটি	Ph	Herbivore
24.	*Puntius ticto*	Ticto barb	তিত পুঁটি	Br	Omnivore
25.	*Puntius gelius*	Golden barb	গিলি পুঁটি	Ph	Omnivore
26.	*Puntius sophore*	Pool barb	জাইত/ভাদি/রৌয়া পুঁটি	Br	Herbivore
27.	*Puntius terio*	Onespot barb	টেরি পুঁটি	Ph	Omnivore
28.	*Oreichthys cosuatis*	Kosuati	কোসোয়াটি	Ph	Omnivore
	Cobidiae				
29.	*Acanthocobitis botia*	Mottled loach	বালিচাটা	Ps	Benthivore
30.	*Schistura corica*	Hilly loach	কইরকা মাছ	Ps	Benthivore
31.	*Schistura beavani*	Greek loach	ধারি লোচ	Ps	Benthivore
32.	*Somileptes gongota*	Gongota loach	পাহাড়ি গুতুম	Ph	Omnivore
33.	*Botia dario*	Bengal loach	রাণী মাছ	Ph	Omnivore
34.	*Botia lohachata*	Reticulate loach	বেটি মাছ	Pl	Detrivore
35.	*Lepidocephalus guntea*	Guntea loach	গুতুম মাছ	Pl	Detrivore
36.	*Lepidocephalus annandalei*	Annandale loach	পুঁইয়া মাছ	Pl	Detrivore
37.	*Lepidocephalus berdmorei*	Burmese loach	পুঁইয়া মাছ	Pl	Detrivore
38.	*Lepidocephalus irrorata*	Loktak loach	পুঁইয়া মাছ	Pl	Detrivore
39.	*Nemachilus zonalternans*	River loach	গুতে মাছ	Pl	Benthivore
40.	*Botia dayi*	Hora loach	বেতাঙ্গী/নুনিন/ বালাবাতিয়া মাছ	Ps	Benthivore
	Siluridae				
41.	*Ompok pabda*	Butter Catfish	মধু পাবদা মাছ	Pl	Carivore
42.	*Ompok pabo*	Pabda Catfish	পাবদা মাছ	Pl	Carivore
	Bagridae				
43.	*Heteropneustes fossilis*	Stinging Catfish	শিং মাছ	Pl	Detrivore
44.	*Chaca chaca*	Squarehead Catfish	ব্যাঙ চাক্কুয়া	Pl	Carnivore
45.	*Mystus cavasius*	Gangetic mystus	কাবাসী/গুলশা টেংরা	Li	Carnivore
46.	*Mystus bleekeri*	Day's mystus	গুলশা টেংরা	Li	Carnivore
47.	*Mystus tengara*	Striped Dwarf Catfish	বুজুরী টেংরা	Li	Carnivore

	Family/Scientific name	Common name	বাংলা নাম	RG	RG
48.	*Mystus vittatua*	Striped River Catfish	টেংরা/গাটিয়া মাছ	Li	Carnivore
49.	*Gagata gagata*	Hudda Catfish	গাং টেংরা	Li	Carnivore
50.	*Gagata cenia*	Cenia	সেনিয়া/কাওয়া	Li	Carnivore
51.	*Hara jerdani*	Kutakanti	কুটাকান্তি	Li	Carnivore
	Notopteridae				
52.	*Notopterus notopterus*	Bronge Feather back	ফলি মাছ	Pl	Carnivore
	Mastacembelidae				
53.	*Macrognathus aculeatus*	Lesser Spiny Eel	তাঁরা বাইম	Ps	Benthivore
54.	*Mastacembelus armatus*	Zig zag Eel	শাল বাইম	Ps	Benthivore
55.	*Mastacembelus pancalus*	Barred Spiny Eel	গুচি/চিকরা/পাঁকাল	Ps	Benthivore
	Osphronemidae				
56.	*Colisa chuna*	Honey Gourami	বৈচা মাছ	Nb	Insectivore
57.	*Colosa fasciatus*	Banded Gourami	খলিসা মাছ	Nb	Insectivore
58.	*Colisa lalius*	Dwarf Gourami	লাল খলিসা	Nb	Insectivore
59.	*Ctenops nobilis*	Frail Gourami	নাপিত/নাপতানি/মধুমালা/বেউকুল মাছ	Nb	Insectivore
	Anabantidae				
60.	*Anabas testudinesu*	Climbing Perch	কই মাছ	Nb	Insectivore
	Gobiidae				
61.	*Stigmatogobius sadanundio*	Goby	গোবি মাছ	Ps	Carnivore
	Nandiae				
62.	*Nandus nandus*	Mud Perch	মেনি/ভেদা মাছ	Pl	Carnivore
63.	*Badis badis*	Badis	নাপিত কই/কই বান্দি	Pl	Carnivore
	Ambassidae				
64.	*Chanda nama*	Elongate Glass-perchlet	নামা চান্দা	Ph	Carnivore
65.	*Parambassis lala*	Highfin Glassy Perchlet	লাল চান্দা	Ph	Carnivore
66.	*Parambassis ranga*	Indian Glassy Fish	গোল চান্দা	Ph	Carnivore

Systematics and authority are according to Smith (1945), Stebra (1962), Talwaer & Jhingran (1991) and Rahman (2005).

TG = Trophic guild, RG= Reproductive guild, Ph= Phytophils, Pl= Phytolithophils, Li= Lithophils, Pe= Pelagophils, Nb= Nest builders, Lb= Live bearers, Mb= Mouth brooder

মিঠাপানির ঝিনুকে মুক্তা চাষ

মুক্তা একটি দামী রত্ন যা সৌখিনতা ও আভিজাত্যের প্রতীক। এটি এমন একটি রত্ন যা জীবিত জীবের দেহের ভিতর জৈবিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। মুক্তা অলংকারে শোভিত আকর্ষণীয়, কাঙ্খিত মূল্যবান একটি রত্ন। মুক্তার প্রধান ব্যবহার অলংকার হলেও কিছু কিছু জটিল রোগের চিকিৎসায় মুক্তা ও মুক্তাচূর্ণ ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে মুক্তা প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হত। ১৮৯০ সালে জাপানী বিজ্ঞানী কোকিচী মিকিমোতো সর্বপ্রথম প্রণোদিত উপায়ে মুক্তা উৎপাদনে সফল হন। এজন্য তাঁকে জাপানী মুক্তা শিল্পের জনক বলা হয়। বর্তমানে চীন, জাপান ও ভিয়েতনামসহ অনেক দেশ প্রণোদিত উপায়ে মুক্তা উৎপাদন করে। আন্তর্জাতিক বাজারে যেমন মুক্তার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে তেমনি আভ্যন্তরিণ বাজারেও মুক্তার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যখন গবেষণাগারে মুক্তা উৎপাদন শুরুই হয়নি, কেবলমাত্র প্রাকৃতিক উৎস থেকেই মুক্তা সংগ্রহ করা হত তখন বিশ্বব্যাপি আমাদের এই উপমহাদেশে প্রাপ্ত মুক্তার ব্যাপক চাহিদা ছিল। আমাদের দেশের মাটি ও পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ মুক্তা চাষের অনুকূল। এছাড়া এদেশের জলবায়ুও মুক্তা চাষ উপযোগী। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৯ সালে মিঠাপানিতে মুক্তা চাষের পরীক্ষামূলক গবেষণা শুরু করে।

- ইনস্টিটিউট কর্তৃক মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপি পরিচালিত জরিপে বাংলাদেশে ৪ ধরণের মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক পাওয়া যায় : (১) *Lamellidens marginalis* (২) *Lamellidens corrianus* (৩) *Lamellidens phenchooganjensis* (৪) *Lamellidens jenkinsianus*। এর মধ্যে *Lamellidens marginalis* ও *Lamellidens corrianus* এই ২ ধরণের ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন হার বেশী।
- ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ঝিনুকে প্রণোদিত পদ্ধতিতে মুক্তা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। মুক্তা উৎপাদনকারী অপারেশনকৃত ঝিনুকের বেঁচে থাকার হার প্রাথমিক অবস্থায় ৬০% এবং তাতে মুক্তা তৈরির হার ৯০%।
- একটি ঝিনুক থেকে সর্বোচ্চ ১২টি মুক্তা উৎপাদিত হয়েছে।
- অপারেশনকৃত ঝিনুকের বিভিন্ন ধরণের চাষ পদ্ধতির ওপর গবেষণা করে আমাদের দেশের উপযোগী চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ঝিনুকে চার রংয়ের (কমলা, গোলাপী, সাদা, ছাই) এবং তিনটি আকারের (গোল, রাইস, আঁকাবাঁকা) মুক্তা পাওয়া গেছে।
- ইমেজ মুক্তা তৈরিতে সফলতা অর্জিত হয়েছে।

মুক্তার প্রকারভেদ : মুক্তা প্রধানত দুই প্রকার।

ক) **প্রাকৃতিক মুক্তা :** প্রকৃতিতে কোন বহিরাগত বস্তু দৈবাৎ ঝিনুকের দেহের নরম অংশে প্রবেশ করে যদি আঘাতের সৃষ্টি করে তবে ঝিনুক সেই আঘাতের যন্ত্রণা থেকে উপশম পেতে বহিরাগত বস্তুটির চারদিকে এক ধরণের লালা নিঃসরণ করতে থাকে। ক্রমাগত নিঃসৃত এই লালা বস্তুটির চারদিকে ক্রমান্বয়ে জমাট বেঁধে প্রাকৃতিক মুক্তায় পরিণত হয়।

খ) **প্রণোদিত উপায়ে উৎপাদিত মুক্তা :** একটি ঝিনুকের ম্যান্টল টুকরা (পর্দার টুকরা) আর একটি জীবিত ঝিনুকে সরাসরি প্রতিস্থাপিত করা হয় যা থেকে লালা নিঃসরণের মাধ্যমে মুক্তা তৈরি হয়। এটি দৈবাৎ কোন ঘটনা নয় সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত। প্রণোদিত উপায়ে মুক্তা তৈরির ক্ষেত্রে অপারেশনকৃত সব কয়টি ঝিনুকই মুক্তা তৈরির জন্য প্রস্তুত থাকে। প্রণোদিত উপায়ে মুক্তা তৈরির কৌশলটিকে অপারেশন বলা হয়ে থাকে। এই অপারেশন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রণোদিত উপায়ে উৎপাদিত মুক্তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

১) **ম্যান্টল টিস্যুর মুক্তা :** জীবিত ঝিনুকের দেহে ম্যান্টল টুকরা প্রবেশ করানো হয়। এই টুকরাটিই লালা ফেলে ধীরে ধীরে মুক্তা তৈরি করে। যেহেতু একটি পাতলা পর্দা থেকে মুক্তা তৈরি হয় তাই এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মুক্তা হতে কমপক্ষে ৩ বছর সময় প্রয়োজন হয়।

অপারেশনের পূর্ববর্তী পরিচর্যা

- অপারেশনের পূর্বে ঝিনুক সংগ্রহ করে পুকুরে ১-৩ মাস প্রতিপালন করে অপারেশনের উপযোগী করে তুলতে হবে
- অপারেশনের ৭ দিন পূর্বে পুকুর থেকে ঝিনুক সিস্টার্নে এনে না খাইয়ে রেখে অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করতে হবে
- অপারেশনের ২ ঘন্টা আগে প্রতিস্থাপনের ঝিনুককে নিচের দিকে মুখ করে ঠান্ডা জায়গায় ট্রেতে রাখতে হবে।

অপারেশন পদ্ধতি : অপারেশনটি দুটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়, টিস্যু টুকরো করা ও টিস্যু প্রতিস্থাপন। অপারেশনের ধাপ দুটি একই সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

ঝিনুক বাছাইকরণ : অপারেশনের জন্য ১-২ বছরের বয়সী স্বাস্থ্যবান ঝিনুক যার বৃদ্ধি রেখা স্পষ্ট এবং শক্তিশালী পা আছে সেটি বাছাই করতে হবে। ঝিনুক রোগ ও ক্ষতমুক্ত হতে হবে।

ম্যান্টল টিস্যু টুকরাকরণ

- অপারেশনের আগে ঝিনুকগুলোর মুখ নিচের দিক করে ট্রেতে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয় যেন ভিতরে পানি জমে না থাকে
- ঝিনুকের দু'টি ভালভ্ বা খোল পুরোপুরি খোলা হয়। ঝিনুক কাঁচি/চাকুর সাহায্যে কেটে ট্রের উপরে রাখা হয়
- ঝিনুকের পশ্চাৎ অংশের ম্যান্টল টিস্যুর প্যালিয়াল লাইন বরাবর কাঁচির সাহায্যে লম্বালম্বিভাবে কাটা হয়
- এরপর চিমটার সাহায্যে টিস্যুটি উল্টো করে তুলে কাঠের বোর্ডের উপর রেখে বাড়তি অংশগুলো ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হয়
- ধারালো ছুরি দিয়ে ২-৩ মিমি. বর্গাকৃতির ছোট ছোট টুকরা করা হয়
- ছোট টুকরোগুলোর উপর এজুমিন দেওয়া হয়। টিস্যু টুকরো সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট পর্যন্ত ব্যবহার উপযোগী থাকে।

টিস্যু প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া

- অপারেশনের আগে ঝিনুকগুলোর মুখ নিচের দিক করে ট্রেতে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয় যেন ভিতরের পানি জমে না থাকে
- প্রথমত স্প্যাচুলার সাহায্যে ঝিনুকের মুখ ৮-১০ মিমি. খুলে স্টুপল দিয়ে আটকিয়ে ঝিনুকটি একটি কাঠের ফ্রেমে স্থাপন করা হয়। এসপিরেটরের সাহায্যে ঝিনুকের গায়ে লেগে থাকা কাঁদা ও লালা পরিস্কার করা হয়
- স্কালপেলের সাহায্যে ম্যান্টল টিস্যুটি কেটে ভোতা মাথার বিশেষ ধরণের সূচ দিয়ে দুই পর্দার মাঝখানে এমনভাবে থলে বা পকেট তৈরী করা হয় যেন পর্দাটি উপরে বা নিচে ছিঁড়ে না যায়
- এরপর বাঁকা নিড্‌লের সাহায্যে টিস্যুটিকে ফাঁকা করে অপর একটি নিড্‌ল এর সাহায্যে পকেটে টিস্যু টুকরা প্রবেশ করানো হয়
- এরপর খুব সাবধানে কাটা অংশটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

চিত্র ১. ঝিনুকে ম্যান্টল টিস্যু প্রতিস্থাপন

২) **নিউক্লিয়াস মুক্তা :** নিউক্লিয়াস মুক্তা তৈরিতে একটি নিউক্লিয়াস এক টুকরা ম্যান্টলসহ জীবিত ঝিনুকের দেহে অপারেশনের মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয়। ম্যান্টল টুকরাটি নিউক্লিয়াসের গায়ে লেগে থাকে। নিউক্লিয়াস মুক্তা উৎপাদনে কম সময় লাগে এবং সহজেই গোলাকৃতি মুক্তা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন এক থেকে দেড় বছরে নিউক্লিয়াস মুক্তা সংগ্রহ করা সম্ভব।

অপারেশনের পূর্ববর্তী পরিচর্যা

- কালো ছিদ্রযুক্ত বাক্সে (৪০ সেমি. × ৩০ সেমি. × ১০ সেমি.) ঝিনুক রেখে পুকুরের পানির উপরের স্তরে ১০ দিন রাখা হয়
- এরপর ১.৫ মি. গভীর পানিতে আরও ১০ দিন রাখা হয়
- এরপর বাক্সটি উপরে তুলে ৩-৪ ঘন্টা রোদের আলোতে শুকিয়ে আবার ২ সেমি. গভীর পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়
- আবারো ১.৫ মি. গভীরে ডুবিয়ে ৩ দিন রেখে পরবর্তীতে সেই ঝিনুকগুলোকে অপারেশন রুমে নিয়ে এসে দুই ঘন্টা রেখে দেওয়া হয়।

ঝিনুক বাছাইকরণ : টিস্যুর জন্য ১-১.৫ বছর বয়সের ঝিনুক এবং টিস্যু ও নিউক্লিয়াস প্রবেশ করানোর জন্য ২-৩ বছরের সুস্থ সবল, রোগমুক্ত ও তরুণ ঝিনুক বাছাই করা হয়।

ম্যান্টল টিস্যু কাটার প্রক্রিয়া

- অপারেশনের আগে ঝিনুকগুলোর মুখ নিচের দিক করে ট্রেতে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয় যেন ভিতরের পানি জমে না থাকে
- ঝিনুকের দু'টি ভালভ্ বা খোল পুরোপুরি খুলে ঝিনুকের পশ্চাৎ অংশের ম্যান্টল টিস্যুর প্যালিয়াল লাইন বরাবর কাঁচির সাহায্যে লম্বালম্বিভাবে কাটা হয়
- এরপর চিমটার সাহায্যে টিস্যুটি তুলে নরম রুমালের উপর রেখে অপর একটি রুমালের সাহায্যে চেপে অতিরিক্ত পানি শুষে নেয়া হয়
- এরপর রুমাল থেকে চিমটার সাহায্যে কাঠের বোর্ডে টিস্যুটি উল্টো করে রাখা হয়। বাড়তি অংশগুলো কেটে ফেলে দেওয়া হয়
- ব্যবচ্ছেদ ছুরি দিয়ে ২-৩ মিমি. বর্গাকৃতির ছোট ছোট টুকরো করা হয়
- ছোট টুকরোগুলোর উপর এজুমিন দেওয়া হয়। টিস্যু টুকরো সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট পর্যন্ত ব্যবহার উপযোগী থাকে।

টিস্যু ও নিউক্লি প্রতিস্থাপন পদ্ধতি

- ঝিনুকের দুটি ভালভ্ বা খোল আংশিক উন্মুক্ত করে অপারেশন স্ট্যান্ড এ রাখা হয়
- স্কালপেলের সাহায্যে ম্যান্টল টিস্যুটি কেটে ভোতা মাথার বিশেষ ধরণের সূচ দিয়ে দুই পর্দার মাঝখানে এমনভাবে থলে বা পকেট তৈরী করা হয় যেন পর্দাটি উপরে বা নিচের অংশে ছিঁড়ে না যায়
- কাটা অংশের দৈর্ঘ্য হতে হবে ৪ মিমি. এবং পকেটের দৈর্ঘ্য ২ সেমি.
- এরপর বাঁকা নিড্লের সাহায্যে টিস্যুটিকে ফাঁক করে অপর একটি নিড্ল এর সাহায্যে প্রথমে পকেটে টিস্যু প্রবেশ করানো হয়
- এরপর কাপ হুক এর সাহায্যে নিউক্লিটি ঐ পকেটেই এমনভাবে প্রবেশ করানো হয় যেন নিউক্লিটি টিস্যুর মাঝখানে বসে থাকে
- এরপর খুব সাবধানে কাটা অংশটি বন্ধ করে দেওয়া হয়
- একই প্রক্রিয়ায় ঝিনুকটির অপর অংশে টিস্যু এবং নিউক্লি প্রবেশ করানো হয়
- এভাবে প্রতিটি ঝিনুকে মোট ৪টি করে টিস্যুসহ নিউক্লি প্রবেশ করানো হয়।

চিত্র ২. ঝিনুকে ম্যান্টল টিস্যু টুকরা ও নিউক্লি প্রতিস্থাপন

৩) **ইমেজ মুক্তা :** ইমেজ মুক্তা হচ্ছে কোন ইমেজ বা ছবিকে মুক্তায় পরিণত করা। মোম, খোলস, কাঠ, প্লাস্টিক ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান দিয়ে নানা রকম ইমেজ তৈরি করে তাকে একটি জীবিত ঝিনুকের দেহে প্রবেশ করানো হয়।

ইমেজ তৈরি : প্রথমে একটি পরিস্কার মৃত ঝিনুকের টিস্যুবিহীন খোলসের ভিতরের অংশে সয়াবিন/সরিষার তৈল দিয়ে পিচ্ছিল করা হয়। এরপর গলানো মোম উক্ত খোলসে ঢালা হয় এবং মোম জমাট বাধার পূর্বে খোলসটি ডানে-বামে নেড়ে মোমের একটি পাতলা স্তর (প্রায় ১.৫ মিমি.) তৈরি করা হয়। এরপর একটি সূঁচের সাহায্যে মোমের স্তরের উপর মৃদু চাপ প্রয়োগ করে পছন্দ মাফিক ইমেজ তৈরি করা হয় এবং তৈরিকৃত ইমেজটি এক মিনিট পরিস্কার পানিতে ডুবিয়ে মোমের খসখসে ভাব দূর করা হয়।

ঝিনুকে ইমেজ স্থাপন : নির্বাচিত ঝিনুকে সতর্কতার সাথে ম্যান্টল টিস্যুর নিম্নাংশে খোলস সংলগ্ন স্থানে ইমেজ স্থাপন করতে হবে। ঝিনুকের মুখ স্ট্যুপলের সাহায্যে ধীরে ধীরে ৮-১০ মিমি. খুলতে হবে। এরপর ঝিনুকের অভ্যন্তরিণ অংশ এসপিরেটরের সাহায্যে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ঝিনুকের খোলসের গায়ে লেগে থাকা পর্দা (ম্যান্টল) সতর্কতার সাথে ইমেজের আকৃতি অনুযায়ী খুলতে হবে। এরপর পর্দা ও ঝিনুকের খোলসের মাঝখানে ইমেজ স্থাপন করতে হবে এবং স্পেচুলার সাহায্যে মৃদু চাপ দিয়ে অভ্যন্তরিণ বাতাস বের করতে হবে। তারপর স্ট্যুপল খুলে ঝিনুকটিকে উর্দ্ধমুখী করে রাখতে হবে। সবশেষে ঝিনুকের খোলসে চিহ্নিতকরণ মার্ক/ট্যাগ দিয়ে জলাশয়ে চাষ করতে হবে।

চিত্র ৩. ইমেজ তৈরি ও ঝিনুকে ইমেজ প্রতিস্থাপন

অপারেশন পরবর্তী পরিচর্যা : অপারেশনের পূর্বে ঝিনুককে না খাইয়ে রাখা হয় বিধায় অপারেশনের পরে ঝিনুকগুলো অনেক দূর্বল হয়ে পরে। এই জন্যে অপারেশনের পরবর্তীতে ঝিনুককে ভালোভাবে পরিচর্যা করা প্রয়োজন।

প্রথম ধাপ : নাইলনের দড়ি দিয়ে তৈরি নেট ব্যাগে ঝিনুক রেখে ব্যাগের মুখ সেলাই করে দড়ির সাহায্যে সিস্টার্নে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই অবস্থাতে এয়ারেটর এর সাহায্যে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে প্রথম ৭ দিন না খাইয়ে রাখতে হবে এবং প্রতিদিন পানি পরিবর্তন করতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ : প্রথম ৭-১০ দিন পর ঝিনুককে খাবার দেওয়া হয়। প্রতি ১,৫০০টি ঝিনুকের জন্য ২০০ লিটার করে প্লাংকটন দেওয়া হয়। প্রতিদিন সকালে পানি পরিবর্তন করে খাবারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এই প্রক্রিয়াটি মোট ১০ দিন করতে হবে।

তৃতীয় ধাপ : দ্বিতীয় ধাপ সম্পন্ন হলে ০.৯% লবণ পানিতে ঝিনুকটিকে ১০ মিনিট রাখা হয় যেন কোন ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু না থাকে। পরবর্তীতে ঝিনুকটিকে খাঁচায় করে পুকুরে রাখা হয়। খাঁচাটি পুকুরের তলদেশে এমনভাবে রাখা হয় যেন ঝিনুকগুলোর ক্ষত নিরাময় হয়। প্রতিদিন পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে ।

চিত্র ৪. ঝিনুকে অপারেশন পরবর্তী পরিচর্যা

পুকুরে অপারেশনকৃত ঝিনুক চাষ পদ্ধতি

পুকুর প্রস্তুতি : মুক্তা চাষের পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যালো থাকা অপরিহার্য। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে মুক্তার রং ভাল হয় এবং ঝিনুকের জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়। মুক্তা চাষের জন্য ১.০-১.৫ মিটার পানি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পুকুর নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়। নির্বাচিত পুকুরের পানি সরিয়ে তলদেশ ভালভাবে রৌদ্রে শুকাতে

হবে। এরপর শতকে এক কেজি হারে কলি চুন ভালভাবে প্রয়োগ করতে হবে। পুকুর শুকানোর ২-৩ দিন পর পুকুরে পানি দিতে হবে। পুকুরে ঝিনুকের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রতি শতকে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১২৫ গ্রাম টিএসপি এবং ৫ কেজি জৈব সার পানিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র ৫. অপারেশনকৃত ঝিনুক চাষ পদ্ধতি

পানির তাপমাত্রা ও পিএইচ : পানির তাপমাত্রা ঝিনুকের খাদ্য গ্রহণ, বৃদ্ধি এবং নেকার নিঃসরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পানির তাপমাত্রার ওপর ঝিনুকের অপারেশন কার্যক্রম সফলতা নির্ভর করে। পানির তাপমাত্রা যখন ২৬-৩০° সে. এর ভেতরে থাকে তখন ঝিনুকের বিপাক ভাল হয়। অপারেশনের ক্ষত দ্রুত শুকায়, ম্যান্টল কোষের বেঁচে থাকার হার উচ্চ মাত্রায় থাকে, দ্রুত পার্ল স্যাক তৈরি হয়, নেকার নিঃসরণ দ্রুত থাকে। এসবই ভাল মুক্তা তৈরির উপযুক্ত শর্ত। পানির তাপমাত্রা ৩০° সে.এর উপরে হলে অপারেশনের ক্ষত দ্রুত শুকায় এবং পার্ল স্যাক দ্রুত তৈরি হলেও ম্যান্টল টিস্যুর বেঁচে থাকার হার কমে যায়। খুব সহজে অপারেশনের ক্ষতে রোগ সংক্রমণ ঘটে ফলে অপারেশনকৃত ঝিনুকের মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়। পানির তাপমাত্রা ১৫° সে. এর নীচে হলে অপারেশন ক্ষত সহজে শুকায় না, ম্যান্টল কোষের দ্রুত মৃত্যু ঘটে। মুক্তা তৈরির সম্ভাবনা বন্ধ হয়ে যায়। মুক্তা চাষে পানির অনুকূল তাপমাত্রা হলো ২৬-৩০° সে.। পানির অনুকূল তাপমাত্রায় ঝিনুক দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং নেকার দ্রুত নিঃসৃত হয়ে মুক্তা গঠিত হয়। অম্লীয় (পিএইচ ৬.৫ এর চেয়ে কম) অথবা ক্ষারীয় (পিএইচ ৮.৫ এর চেয়ে বেশি) পিএইচ ঝিনুকের বৃদ্ধি এবং মুক্তা উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত নয়। ঝিনুকের বৃদ্ধির জন্য পানির অনুকূল পিএইচ বা ক্ষারত্ব ৭-৮। পুকুরের পানির পিএইচ কমে গেলে শতাংশে ১ কেজি হারে পাথুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

পানির প্রবাহ : পুকুরের পানিতে সামান্য প্রবাহ সৃষ্টি করা গেলে ঝিনুকের বৃদ্ধি সাধনে এবং মুক্তা উৎপাদনে সহায়ক হয় । তাই সম্ভব হলে প্যাডল হুইল ব্যবহার করে সামান্য প্রবাহের ব্যবস্থা করা যায়। মাসে একবার পুকুরের কিছু পরিমাণ পানি পরিবর্তন করলে ভাল হয়।

প্রাকৃতিক খাদ্য : ঝিনুকের খাদ্য গ্রহণ মূলত পরোক্ষ। ফুলকার মাধ্যমে এরা পানিতে বিদ্যমান এলজি, ক্ষুদ্রাকার জুওপ্লাংকটন, অণুজীব অর্থাৎ ফাইটোপ্লাংকটন ইত্যাদি জৈব দ্রব্য ছেঁকে খায়। ডায়াটম, গোল্ড এলজি, গ্রীণ এলজি, ইউগ্লেনা ইত্যাদি ঝিনুকের উপযোগী প্রাকৃতিক খাদ্য। তাই পুকুরে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান রাখার জন্য নিয়মমাফিক সার প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঝিনুক চাষের জন্য পানির উপযুক্ত রং হলো হলুদাভ সবুজ এবং স্বচ্ছতা ৩০ সেমি.। নিম্ন বর্ণিত হারে পুকুরে সার প্রয়োগ করতে হবে :

সারের নাম	প্রয়োগ হার	প্রয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োগের সময়
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম / শতাংশ প্রতি ১৫ দিন অন্তর	সরাসরি পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে	সকালে সূর্যের আলোতে
টিএসপি	১২৫ গ্রাম / শতাংশ প্রতি ১৫ দিন অন্তর	প্রয়োগের পূর্বে ৩ গুণ পরিমাণ পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে	
জৈব সার	৫ কেজি / শতাংশ প্রতি ১৫ দিন অন্তর	সরাসরি পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে	

ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে সাপ্তাহিক অথবা পাক্ষিকভাবেও সার প্রয়োগ করা যায়। সূর্যালোকিত দিনে সকাল ১০ টার মধ্যে গুলানো সার পুকুরের চারদিকে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। বৃষ্টির সময় বা মেঘলা দিনে এবং শীতকালে পানির তাপমাত্রা খুব কমে গেলে সার প্রয়োগ করা উচিত নয়।

ক্যালসিয়াম : ক্যালসিয়াম মুক্তা উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। ঝিনুকের খোলস এবং মুক্তার প্রধান উপাদান হলো ক্যালসিয়াম। পানিতে ক্যালসিয়াম যেন প্রতি লিটারে ১০ মিলিগ্রাম এর চেয়ে বেশি থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এজন্য পুকুরে প্রতি শতাংশে ২০০-২৫০ গ্রাম জিওলাইট প্রয়োগ করতে হবে।

অন্যান্য পুষ্টি পদার্থ : ঝিনুক এবং অন্যান্য জলজ জীবের জন্য ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকা, ম্যাঙ্গানিজ এবং লৌহ প্রয়োজন। জৈব এবং অজৈব সার প্রয়োগের মাধ্যমে পানিতে এদের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

চাষের পুকুরে ঝিনুক স্থাপন : ঝিনুক রাখার জন্য আড়াআড়িভাবে পুকুরে নাইলনের মোটা রশি টানাতে হবে। রশির দুইপ্রান্ত বাঁশের খুঁটির সাথে বাঁধতে হবে। পরিমাণমত ফ্লোট বা ভাসান যুক্ত করে রশিটিকে ভাসমান রাখতে হবে। ঝিনুক নেটের ব্যাগে রেখে দড়ির সাহায্যে নাইলনের সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে হবে। শরৎ হেমন্ত ও বসন্তে নেট ব্যাগ স্থাপনের গভীরতা হবে ২০ সেমি. এবং গ্রীষ্মে হবে ৩০-৩৫ সেমি.। বড় জলাশয় হলে সেক্ষেত্রে বানা দিয়ে ছোট করে নেওয়া যেতে পারে। প্রতি শতাংশে ৮০-১০০ হারে ঝিনুক মজুদ করলে মুক্তার বৃদ্ধি ভাল হয়।

পুকুরে প্লাংকটন জন্মাবার পরপরই রুই, গ্রাসকার্প, মৃগেল ইত্যাদি মাছের পোনা (কমপক্ষে ৫ সেমি. দৈর্ঘ্যের) পুকুরে ছাড়তে হবে। এভাবে মিশ্রচাষে প্রতি শতাংশে ৮০-১০০টি ঝিনুক সহ ৮-১০ ইঞ্চি আকারের রুই ও কাতলের পোনা ছাড়া উত্তম। আধুনিক পদ্ধতিতে দড়ির সাথে নেট ব্যাগে ঝিনুক ঝুলিয়ে চাষ করা হয়। প্রতিটি নেট ব্যাগে ২-৩ টি করে ঝিনুক রাখতে হবে। দুটি নেট ব্যাগের মধ্যে দূরত্ব থাকবে ৪০-৪৫ সেমি. এবং দুইটি রশির মধ্যে দূরত্ব হবে ১.২-১.৫ মিটার। এছাড়া সরাসরি পুকুরের তলদেশে ছেড়েও ঝিনুক চাষ করা যায়। ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদনের জন্য কমপক্ষে ৩ বৎসর সময় লাগে। ঝিনুক ও মাছের সমন্বিত চাষের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ১ম, ২য়, ৩য় বৎসর মাছ বিক্রি করে ও ৩য় বৎসরে ঝিনুক থেকে মুক্তা সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। অপারেশনকৃত ঝিনুককে মাছের পুকুরে মাছের সাথে একত্রে চাষ করা সম্ভব। মাছ চাষে যে ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা হয় একই ব্যবস্থাপনা মুক্তা চাষে ব্যবহৃত হয়। মুক্তা চাষে বাড়তি কোন খাবারের প্রয়োজন নেই। পুকুরে কেবল নিয়মিত চুন ও সার প্রয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশে মুক্তা চাষের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

পৃথিবীর অনেক দেশই মুক্তা চাষে সফলতা লাভ করলেও বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ শুরু হয়নি। তবে বাংলাদেশে মুক্তা চাষের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে কারণ :

- আমাদের রয়েছে বিপুল পরিমাণ জলরাশি যেখানে স্বাদুপানির মাছের সাথে সাথী ফসল হিসেবে সহজেই মুক্তা চাষ করা সম্ভব
- দেশের জলবায়ু ও প্রকৃতি মুক্তা চাষ উপযোগী
- ঝিনুক চাষে সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। ব্ল্যাক কার্প ও ছেঁকে খাদ্য খায় এমন মাছ ব্যাতিরেকে অন্যান্য মাছের সাথে মুক্তা চাষ লাভজনক । এ ক্ষেত্রে মুক্তা মাছের সাথে বাড়তি ফসল হিসাবে পাওয়া যায়
- পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে গ্রামীণ যুবামহিলারা ৩/৪ দিনের প্রশিক্ষণে ঝিনুক অপারেশনে দক্ষ হয়ে উঠে। ফলে দেশের পল্লী এলাকায় যুবামহিলারা মুক্তা চাষে প্রশিক্ষিত করা গেলে তাঁরা বাণিজ্যিকভাবে মুক্তা চাষে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে
- গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই পুকুর/দিঘী থাকে। তাই মুক্তা চাষে গ্রামীণ মহিলাদের নিয়োজিত করা গেলে তা নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক হবে
- সার্বিক বিবেচনায় মুক্তা চাষের সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করা গেলে বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে মুক্তা চাষের সম্ভাবনা বিপুল।

বাংলাদেশে প্রচুর পুকুর, দিঘী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় নদী-নালা আছে যা মুক্তা চাষ উপযোগী। মুক্তা উৎপাদনের পাশাপাশি ঝিনুকের খোলস দিয়ে বোতাম, ফুলদানি, খেলনা, পুতুল, নারীর অলঙ্কার ও গৃহ সাজানোর বিভিন্ন উপাদানও প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। প্রণোদিত উপায়ে ঝিনুক থেকে মুক্তা চাষ প্রযুক্তি অনেকটা সূচি শিল্পের মত যা গ্রামীণ মহিলারা সহজে আয়ত্ত করতে পারে। তাই মুক্তা চাষে নারীদের নিয়োজিত করা গেলে জলাশয়ের সর্বোচ্চ ব্যবহারের পাশাপাশি গ্রামীণ মহিলাদের দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে।

ডলফিন সংরক্ষণ

সাধারণভাবে জলজ ছোট জাতের স্তন্যপায়ী প্রাণিই ডলফিন। অন্যান্য জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণির মাঝে রয়েছে তিমি ও ডুগং। মাছের সাথে ডলফিনের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ডলফিনের শরীরে ছোট ছোট লোম আছে, এরা বাচ্চা প্রসব করে ও বাচ্চা ডলফিন কমপক্ষে এক বছর মায়ের সঙ্গ ছাড়া বাঁচে না। ডলফিন উষ্ণ রক্তের প্রাণি, ফুসফুস আছে ও শ্বাস গ্রহণের জন্য তাকে অবশ্যই পানির উপরে আসতে হয়। অপরদিকে, মাছের দেহ সাধারণত আঁইশে আবৃত, ডিম থেকে পোনা বা বাচ্চা হয় এবং পোনা স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে। মাছ শীতল রক্তের প্রাণি ও ফুলকার সাহায্যে পানি হতে অক্সিজেন নিয়ে থাকে। ডলফিন প্রাণিভোজী- মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়া খেয়ে বেঁচে থাকে।

নদী বা সাগরে ডলফিনের উপস্থিতি স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ইঙ্গিত বহন করে। উপকূল ও সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণে তাই ডলফিনের গুরুত্ব অনেক। সাধারণত কক্সবাজার ও টেকনাফের সাগর উপকূলে কিংবা মাছ অবতরণ কেন্দ্রে মৃত ডলফিনের দেখা মিললে খবরের পাতায় তা আসে। কিন্তু আমাদের বিস্তৃত সমুদ্র উপকূলে ডলফিন ধরা বা মারা যাওয়ার খবরের কতটুকুই আমরা জানতে পারি।

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রজাতির ডলফিন

ইরাবতী ডলফিন *Orcaella brevirostris* : আইইউসিএন এর তথ্য অনুযায়ী অতিবিপন্ন প্রজাতির গোল মাথা বিশিষ্ট সুস্পষ্ট ঠোঁট ছাড়া এ প্রকার ডলফিন ২.১ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এদের পৃষ্ঠ পাখনা ছোট ও ত্রিকোনা। গায়ের রং পিঠের দিকে ধুসর, পেটের দিকে সাদা। এরা মিঠাপানির নদী হতে লবণাক্ত বা আধা-লবণাক্ত পানিতে বাস করে। লবণাক্ত পানিতে সাধারণত প্যারাবন বিধৌত এলাকায় ইরাবতী ডলফিন বেশি দেখতে পাওয়া যায়। ইরাবতী ডলফিন খুবই সামাজিক, সাধারণত ১-৫টি দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে। বিশ্বে ইরাবতী ডলফিনের ৯০ শতাংশই বাংলাদেশের জলসীমা বিশেষত সুন্দরবন উপকূলে 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের সুন্দরবনের নদী-খালে প্রায় ৪০০টি ও সুন্দরবন সন্নিহিত সাগর উপকূলে ৫,৫০০টি ইরাবতী ডলফিন রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, চীন, ফিলিপাইন ও অস্ট্রেলিয়াতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক বছরে বাংলাদেশ সরকার সুন্দরবন উপকূলে 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' অঞ্চলে ১,৭৩০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ডলফিনের আধিক্যের কারণে দেশের প্রথম সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marine Protected Area) ঘোষণা করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষত পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও সুন্দরবনের নদীতে মিঠাপানির প্রবেশ বাধাগ্রস্থ হওয়ার এদের জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখিন। মাছ ধরার বড় ফাঁস জাল, ইলিশ জাল, বেহুন্দি জাল বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে হাঙ্গর ও শাপলা পাতা ধরার জালে আটকা পড়ে এরা মারা পড়ে। কক্সবাজার উপকূলে বিগত বছরগুলোতে বেশ কিছু মৃত ইরাবতী ডলফিন পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে জেলেদের জালে ধরা পরার পর এদের তীরে ফেলে দেওয়া হয়।

হামব্যাক বা গোলাপী ডলফিন *Sousa chinensis* : লম্বা ঠোঁট ওয়ালা সর্বোচ্চ ২.৮ মিটার দৈঘ্যের এ জাতের ডলফিন আমাদের উপকূলে প্রায়শই দেখা মিলে। এদের বাঁকানো পৃষ্ঠ পাখনা দেহের পিছনের দিকে অবস্থিত ও দেহবর্ণ নীলাভ ধুসর হতে গোলাপী আভার দুধ রঙ্গের হয়ে থাকে। হামব্যাক ডলফিন বড় দলে প্রায় ১০টি করে চলাফেরা করে। এরা দক্ষিণ আফ্রিকা হতে শুরু করে ভারতীয় উপমহাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ চীন হয়ে কুইনসল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

সুন্দরবনসহ আমাদের উপকূলে এ জাতের ২০০টি ডলফিন রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

বটলনেক ডলফিন *Tursiops aduncus* : বোতল আকৃতির ঠোটের জন্য নাম দেওয়া এ জাতের ডলফিন প্রায় ২.৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। অন্যান্য জাতে ডলফিনের তুলনায় এদের পাখনাগুলো বেশ বড়। ধুসর হতে কাল রঙ্গের বটলনেক ডলফিনের সংখ্যা আমাদের উপকুলের 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' এ ২,০০০ এর উপরে, যা কিনা বিশ্বে দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় একক পপুলেশন।

চিত্রা ডলফিন *Stenella attenuata* : একটি পূর্ণবয়স্ক চিত্রা ডলফিন আকারে ১.৬-২.৬ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এদের দেহ চোঙ্গাকৃতি ও লম্বা এবং সরু লম্বা ঠোট বিদ্যমান। দেহে ফোটা ফোটা দাগের এ জাতের ডলফিন পৃথিবীর প্রায় সব সমুদ্র উপকূলে দেখতে পাওয়া যায়। সুন্দরবন উপকূলে 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' অঞ্চলে এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এদেশে চিত্রা ডলফিন সম্পর্কে বেশি তথ্য জানা যায়নি।

ঘূর্ণী ডলফিন *Stenella longirostris* : দেহ অক্ষ বরাবর লাফ দেওয়ার স্বভাব ও গূর্ণীর জন্য এদের এই নামকরণ। বেশ লম্বা ঠোঁটের নলাকৃতির গূর্ণী ডলফিন দৈর্ঘে ২-২.৪ মিটার হয়ে থাকে। এদের পৃষ্ঠ পাখনা ত্রিকোনা থেকে বাঁকানো। তিনটি রঙ্গের মিশ্রিত এদের দেহ বর্ণ পিঠের অংশ কালো, দুই পার্শ্বে ধুসর ও পেটের অংশ সাদা। বাংলাদেশে ঘূর্ণী ডলফিন সম্পর্কে বেশি তথ্য জানা যায়নি যদিও 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' অঞ্চলে এদের উপস্থিতি রয়েছে।

গাঙ্গেয় ডলফিন *Platanista gangetica gangetica* : স্থানীয়ভাবে শুশুক নামেই এরা বেশি পরিচিত। এর প্রথম আবিস্কার ঘটে ভারতের গঙ্গা নদীতে। পরবর্তীতে নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশে এদের সরব উপস্থিতি দেখা যায়। পূর্বে দেশের প্রায় সব বড় নদীতে দেখা মিললেও বর্তমানে কর্ণফুলি, মেঘনা, ডাকাতিয়া, পদ্মা, যমুনা ও সুন্দরবনের নদীতে কিছু পরিমাণে এদের দেখা যায়। সাধারণত এদের সাগর উপকূলে দেখা মিলে না। একটি পূর্ণাঙ্গ শুশুক ১.৫-২.৫ মিটার দীর্ঘ ও ৯০ কেজি ওজনের হয়ে থাকে। এরা একত্রে ১৫-২০ টি পর্যন্ত দল বেঁধে চলাচল করে। কর্ণফুলী ও সাঙ্গু নদীর মোহনায় প্রায় ২০০টি গাঙ্গেয় ডলফিন দেখতে পাওয়া যায়। আইইউসিএন এর তথ্য অনুয়ায়ী বাংলাদেশে শুশুক একটি বিপন্ন প্রজাতি।

ডলফিন খুব বুদ্ধিমান প্রাণি হিসেবে বিবেচিত। এরা রাক্ষুসে স্বভাবের হলেও প্রায়শই এরা জেলেদের উপকার করে থাকে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এদেশের প্রায় সকল নদ-নদীতে এক সময় 'শুশুক' দেখা যেত, কিন্তু নদীতে সবসময় পর্যাপ্ত পানি ও খাদ্য না থাকা এবং দূষণের কারণে নদ-নদীতে এদের এখন দেখাই যায় না। সাম্প্রতিক এক গবেষণা পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশের সুন্দরবন ও সংলগ্ন সাগর উপকূলে প্রায় ১১ প্রজাতির ডলফিন রয়েছে বলে জানা যায়। সুন্দরবন সংলগ্ন 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' অঞ্চলে পৃথিবীতে অতিবিপন্ন প্রজাতির ৫,০০০ ইরাবতী

ডলফিন দেখা গেছে যা বিশ্বে ইরাবতী ডলফিনের মোট সংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ। তাই বাংলাদেশের সাগর উপকূল বিশ্বে ডলফিনের অন্যতম বাসস্থান হিসেবে বিবেচিত।

আমাদের জেলে সম্প্রদায় ডলফিনকে তাদের বন্ধু বা সাগরে সাহায্যকারী বলে মনে করে। তারা সরাসরি ডলফিন না মারলেও মাঝে মাঝে জালে আটকা পড়ে ও দুর্ঘটনাবশত মারা যায়। তাই ডলফিন রক্ষায় জেলে সম্প্রদায়সহ সবাইকে আরও সচেতন হতে হবে। ডলফিন রক্ষার মাধ্যমে আমরা অন্যান্য জলজ প্রাণি সংরক্ষণ তথা জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা দিতে পারি।

আমাদের করণীয়

- সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে। বিপন্ন প্রাণি ডলফিন জালে ধরা পড়লে তাকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।
- কারেন্ট জাল ও অন্যান্য ছোট ফাঁসের ফাঁস জাল দিয়ে সাগরে মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে।
- উপকূলে মানবসৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি

মিঠাপানির মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি

০১. রুই জাতীয় মাছের উন্নত নার্সারী ব্যবস্থাপনা।

০২. কৃত্রিম প্রজননের জন্য পিটুইটারী গ্লান্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

০৩. পুকুরে রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ।

০৪. বিপন্ন প্রজাতির মাছের (মহাশোল, স্বরপুঁটি, গনিয়া, বাটা, গুজি, মেনি ইত্যাদি) প্রজনন ও পোনা উৎপাদন।

০৫. থাই পাঙ্গাসের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন।

০৬. পুকুরে পাঙ্গাস মাছের চাষ।

০৭. বিএফআরআই সুপার তেলাপিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ।

০৮. সুপার তেলাপিয়ার মনোসেক্স পোনা উৎপাদন ও চাষ।

০৯. মৌসুমী পুকুরে রাজপুঁটির চাষ।

১০. পাবদা মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ।

১১. গুলশা মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ।

১২. মাগুর মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ।

১৩. কৈ মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ।

১৪. শিং মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ।

১৫. গলদা চিংড়ির গৃহাঙ্গন হ্যাচারী মডেল ও পোনা উৎপাদন।

১৬. রুই জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ।

১৭. ওভার উইন্টার্ড পোনা ব্যবহারে রুই জাতীয় মাছ উৎপাদন।

১৮. রুই মাছের উন্নত জাত।

১৯. তেলাপিয়ার উন্নত জাত।

২০. রাজপুঁটির উন্নত জাত।

২১. থাই কৈ মাছের জাত উন্নয়ন।

২২. লাল তেলাপিয়ার জাত উন্নয়ন।

২৩. চিতল মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন।

২৪. ধান ক্ষেতে মাছের সমন্বিত চাষ।

২৫. পুকুরে হাঁস ও মাছের সমন্বিত চাষ।

২৬. পুকুরে মুরগী ও মাছের সমন্বিত চাষ।

২৭. দেশীয় উপকরণ সহযোগে স্বল্প মূল্যের মৎস্য খাদ্য উৎপাদন।

২৮. স্বল্পমূল্যের বিএফআরআই মডেল মৎস্য খাদ্যের পিলেট মেশিন তৈরি।

২৯. মাছের রোগ নির্ণয়, প্রতিকার ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা।

৩০. স্বাদুপানির ঝিনুকে মুক্তা চাষ।

৩১. বিপন্ন প্রজাতির ফলি মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন।

৩২. কুচিয়া মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন।

৩৩. একোয়াপনিক গার্ডেনিং।

৩৪ কৈ মাছের সাথে শিং ও তেলাপিয়ার মাছের মিশ্র চাষ।

৩৫. বিপন্ন প্রজাতির টেংরা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন।

৩৬. খাঁচায় মাগুর মাছের চাষাবাদ।

৩৭. পুকুরে তেলাপিয়ার সাথে মাগুর ও গুলশা মাছের চাষ।

৩৮. ভিয়েতনামী কৈ মাছের মড়ক প্রতিরোধে ভ্যাকসিন তৈরি।

উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি

৩৯. ইলিশসম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা।

৪০. প্লাবনভূমির মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা।

৪১. জলজ পরিবেশে ও মাছের ওপর কীটনাশকের বিষক্রিয়া।

৪২. পেনে মাছ চাষ।

৪৩. পাহাড়ী ঘোনায় পেনে মাছ চাষ।

৪৪. হালদা নদীর মৎস্য ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা।

৪৫. ইলিশ উৎপাদনে জাটকা ও প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণে ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম চিহ্নিতকরণ।

উপকূলীয় মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি

৪৬. উন্নত পদ্ধতিতে ঘেরে বাগদা চিংড়ির চাষ।

৪৭. কাঁকড়া ফ্যাটেনিং কৌশল।

৪৮. ফসল চক্রভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি ও মাছ চাষ।

৪৯. ভেটকির সাথে তেলাপিয়ার চাষ।

৫০. রূপান্তরিত আবদ্ধ জলাশয়ে আধা-নিবিড় বাগদা চাষ।

৫১. ফসল চক্রভিত্তিক বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষ।

৫২. বাগদা চিংড়ির সাথে তেলাপিয়া ও রাজপুঁটির মিশ্রচাষ।

৫৩. গলদা চিংড়ি ও মনোসেক্স তেলাপিয়ার মিশ্রচাষ।

৫৪. নোনা টেংরার পোনা উৎপাদন ও চাষ।

৫৫. গলদা চিংড়ির আগাম ক্রুড উৎপাদন।

৫৬. পারশে মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন।

৫৭. সামুদ্রিক বা লোনাপানির মাছের পোনা উৎপাদনে লাইভ ফিড চাষ।

৫৮. চিংড়ির রোগ সনাক্তকরণ, প্রতিকার ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা।

৫৯. প্রাকৃতিক উৎস হতে বাগদা চিংড়ির পোনা সংগ্রহ ও জীববৈচিত্রে ক্ষতিকর প্রভাব নির্ণয়।

৬০. 'বিএফআরআই মেকানিক্যাল ফিশ ড্রায়ার' ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগতমানসম্পন্ন শুটকি মাছ উৎপাদন।

গণভবন লেকে ১৯৭৩ সালে মাছের পোনা অবমুক্ত করছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিলুপ্তপ্রায় মাছ সংরক্ষণে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ইনস্টিটিউটকে জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১৭ প্রদান করছেন